রাষ্ট্রীয় জীবন চরিতমালা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এস. কে. বোস

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি

ISBN 81-237-0869-6

প্রথম প্রকাশ : 1972 (শক 1894)
পঞ্চম মুদ্রণ : 1994 (শক 1916)

মূল্য : 13.50
Ishwar Chandra Vidyasagar *(Bengali)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, এ-5 গ্রীন পার্ক নয়া দিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

সমস্যার সম্মুখীন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এক বিরাট পুনর্জাগরণ হয়েছিল। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক নূতন চেতনা দেখা দিয়েছিল। নানা দিক থেকে দেশের তখন সঙ্গীন অবস্থা। সেই অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা এই সময় সুরু হল। দেশের পুনরুত্থানের কাজে যে সব মনীষী অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণতঃ দেখা যায় রাজনৈতিক সংস্কারের আগে সামাজিক বা শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম সাধনায় পরবর্ত্তী যুগে রাজনৈতিক জাগরণের বনিয়াদ তৈরী হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সরল ও দৃঢ়চেতা মানুষ। তিনি সারা জীবন সমাজ ও শিক্ষার উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। এ কাজে তাঁকে অনেক আত্মত্যাগও করতে হয়েছিল। যেমন ছিলেন সাহসী পুরুষ তেমনি করতেন সাহসের সঙ্গে কাজ। তাই তাঁর সব প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠত।

পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে তখন আমাদের দেশের পুরাতন ভাবধারাকে যাচাই করে নেওয়ার বিক্ষোভময় যুগ। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে কিছু সংখ্যক লোকের মনে ঐতিহ্যময় পুরাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব জাগে।

বিচারমুখী মন নিয়ে তাঁরা হিন্দু ধর্ম্মকে যাচাই করতে সুরু করেন। নূতন শিক্ষার প্রভাবে অনেকের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছিল। সংস্কারমুক্তির ব্যাপারে তাঁরা বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন। আর একদল লোক সনাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে থেকে এই নূতন শিক্ষার আলোর পথরোধ করতে লাগলেন। সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের সঙ্কটময় যুগে জীবন খুবই বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেই যুগে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি নূতনের সংস্পর্শে বিভ্রান্ত হলেন না বা পুরাতনের কঠিন আবরণের মধ্যেও আত্মগোপন করে রইলেন না। বিদ্রোহীর আবেগ ও সংস্কারকের ধৈর্য্য নিয়ে বিদ্যাসাগর সেই যুগের সম্মুখীন হলেন এবং ক্রমে তাঁর কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল সামাজিক চিন্তাকে আরও বিস্তৃত রূপ দিলেন। পাণিক্করের মতে রাজা রামমোহন রায় ভারতের প্রথম আধুনিক ব্যক্তি। নানা দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এমন একটা দুর্লভ গুণ ছিল যার ফলে তিনি গোঁড়া পরিবারে জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষালাভ করেও সেই পারিপার্শ্বিকের উর্দ্ধে উঠে কুসংস্কার-মুক্তি ও প্রগতির কাজে অগ্রগামী হতে পেরেছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। সনাতন শিক্ষার ঐতিহ্যে লালিত হয়েও তিনি পশ্চিমের নূতন আলোর দ্বার রুদ্ধ করেন নি। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা করবার সময় তিনি প্রাচ্যের শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষার সমন্বয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন জনশিক্ষার প্রবর্ত্তক। তিনি বিশ্বাস করতেন, জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে না পড়লে সমাজ উন্নত হবে না।

শতাব্দীর পথ অতিক্রম করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম প্রগতি, ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও করুণার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সমস্ত বাংলা দেশ তাঁকে 'বিদ্যাসাগর',—এই প্রিয় নামে অভিহিত করে।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের প্রথম অংশের বিশদ বিবরণ তাঁর বাংলায় লেখা অসমাপ্ত আত্ম-কাহিনী থেকে জানা যায়।

তিনি বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত একজন আদর্শ বীরপুরুষের জন্মের উপযুক্ত স্থান নয় এই অখ্যাত বীরসিংহ গ্রাম। কিন্তু কখনও কখনও ইতিহাসের অজ্ঞেয় নিয়মে ক্ষুদ্র গ্রামের মৃণ্ময় কুটীর থেকে বিরাট সম্ভাবনা ও বিরাটতর পরিপূর্ণতা আসে। বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দীন কুটীরে ১৮২০ সালের ১৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। গল্প প্রচলিত আছে যে তাঁর জন্মের পূর্বেই একজন জ্যোতিষী শিশুর বিরাট ভবিষ্যতের কথা বলে দিয়েছিলেন। জন্মের পর তাঁর কোষ্ঠী গণনা করে দেখা গিয়েছিল যে তিনি ভবিষ্যতে বিরাট পুরুষ হবেন কিন্তু এঁড়ে বাছুরের মত জেদী হবেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পরিবার ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁরা সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁরা সনাতন সংস্কৃতির জন্য গর্ব অনুভব করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ হুগলী জেলার বনমালীপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভাইদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন এবং নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন

তখন তার স্ত্রী দুর্গাদেবী বীরসিংহ গ্রামে পিত্রালয়ের কাছে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতে লাগলেন।

দরিদ্র রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন মহৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তি। তাঁর সুবিখ্যাত পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য সেই চরিত্রের অমূল্য উত্তরাধিকারই তিনি রেখে গিয়েছিলেন।

সন্তান-সন্ততি নিয়ে দুর্গাদেবী অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর হলে তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতা যাওয়া স্থির করলেন। কলকাতার অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে কোনমতে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য তাঁকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

ঐ সময় জব চার্ণকের কলকাতা ছিল প্রাণোচ্ছ্বল সহর। লর্ড ওয়েলেসলী কলকাতাকে 'প্রাসাদ-নগরী' করে গড়ে তুলে-ছিলেন। কলকাতা তখন ছিল খুবই আকর্ষণীয় স্থান ও আমাদের বিদেশী শাসকদের প্রিয় শাসন কেন্দ্র। যে কোনও ব্যক্তি এই কর্ম্মচঞ্চল সহরে এসে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে প্রলুব্ধ হতেন। তখনকার দিনে ভাসা ভাসা ইংরেজী জানা থাকলেই সাফল্যের পথ প্রশস্ত ছিল। ঠাকুরদাস সামান্য ইংরেজী শিখে নিয়ে মাসিক দু'টাকা আয়ে কাজ সুরু করলেন। সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁর পিতৃবন্ধু ও কলকাতার আশ্রয়দাতা ভাগবত চরণ সিংহের কাছ থেকে তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। ২৪ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদের প্রথম সন্তান।

ভগবতী দেবীর চরিত্র ছিল অসাধারণ। তাঁর চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল। উদারতা ও দয়ালুতা ছিল তাঁর চরিত্রের

বিশেষ গুণ। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর মায়ের কাছ থেকে এই গুণগুলি পেয়েছিলেন।

শিশুর মহান ভবিষ্যতের কথা জ্যোতিষী আগেই বলেছিলেন। তার পরিচয় পেতেও দেরী হল না। প্রথম থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র যেমন চঞ্চল ছিলেন তেমনই বয়সের তুলনায় তাঁর পরিণত বুদ্ধি ছিল। তাঁর স্বভাবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। তিনি ছেলেবেলায় খুব দুষ্ট ছিলেন এবং মা, বাবা ও প্রতিবেশীদের বিরক্ত করতেন। তিনি নিজেই তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে বকুনী কিম্বা মারধোর করে তাঁকে শোধরানো যেত না। তাঁর সেই চঞ্চলতা ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র আশ্চর্য্যরকমভাবে তাড়াতাড়ি তাঁর পাঠশালার পড়া সমাপ্ত করেন। সকলেই এতে বিস্মিত হয়ে যান, এমন কি তাঁর শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি তখন প্রস্তাব করেন যে বালককে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত।

সেইমত ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসে এক শুভদিন দেখে ঠাকুরদাস কালীকান্ত, ভৃত্য আনন্দরাম ও ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিচিত্র কলকাতা সহরের দিকে যাত্রা করলেন। গ্রাম থেকে কলকাতা ছিল ৬০ মাইল দূর, তিন দিনের দীর্ঘ ও পায়ে হাঁটা কঠিন পথ। তাঁদের এই যাত্রা ছিল যেন পুরানো জগৎ থেকে নূতন জগতের অভিমুখে, জরাজীর্ণ অতীত থেকে প্রকাশমান ভবিষ্যতের দিকে। পথে জায়গায় জায়গায় বালককে কোলে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী বালক। যেতে যেতেই তিনি এক আশ্চর্য্য

ব্যাপার করলেন। পথে দূরত্বের মাপ দেওয়া নিশানাফলকে ইংরাজীতে সংখ্যা লেখা ছিল। বালকের অনুরোধ উপরোধে ঠাকুরদাস তাকে সংখ্যাগুলি বুঝিয়ে দিলেন। দেখা গেল কলকাতা পৌঁছানর পূর্ব্বেই ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজী সংখ্যামালা শিখে ফেলেছেন।

কলকাতায় ভাগবত চরণের বাড়ীতে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। তিনি অবশ্য তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁর ছেলে জগৎদুর্লভ ও বিধবা মেয়ে রাইমণি তাঁদের সাদরে গ্রহণ করলেন। বিদ্যাসাগর জীবনে কোনও দিন রাইমণির দুর্লভ স্নেহের কথা বিস্মৃত হন নি। রাইমণির অকাল বৈধব্য তাঁর বিকাশোন্মুখ মনকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল।

স্থানীয় পাঠশালায় কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র পড়াশুনা করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। এইবার প্রশ্ন উঠলো কি শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হবে—ইংরাজী, না সংস্কৃত।

এইটাই ছিল সে যুগের বড় প্রশ্ন। ইংরাজী শিক্ষা ও প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে তখন তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলছিল এবং তার ভিতর দিয়ে সে যুগের দ্বিধা-বিভক্ত জনমত প্রকাশ পাচ্ছিল। তখন দেশের ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়ছিল। প্রাচ্যশিক্ষা নিজেকে কোনও মতে অসহায়ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সুরুতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জন-শিক্ষার কোনও দায়িত্ব বোধ করতেন না। ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্ট যখন এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করলেন তখন তারা প্রাচ্যশিক্ষা সমর্থন করার নীতি গ্রহণ করলেন। ফলে কলকাতা, মাদ্রাসা ও বেনারসের সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজী শিক্ষা জনপ্রিয় হতে সুরু করেছিল।

কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজ ভদ্রলোক ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার করতে চাইছিলেন। ১৮২৩ সালেই এলফিনষ্টোন ইংরাজী ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়, আলেকজাণ্ডার ডাফ ও মানবহিতৈষী ডেভিড হেয়ারের মত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার লাভ করছিল এবং ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহও বেড়ে যাচ্ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সমর্থক। তিনি কেবলমাত্র সমর্থন করেই ক্ষান্ত হননি, ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে একটি পত্রে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালী প্রচলনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় নি,—১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ারের মত শুভানুধ্যায়ী বিদেশীদের সাহায্যে কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু নাগরিকেরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই হিন্দু কলেজ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের এবং ফলস্বরূপ, সামাজিক বিদ্রোহেরও কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই কলেজের শিক্ষক, বিদ্রোহী ইউরেশীয়ান দেশপ্রেমিক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্রদল। হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ডিরোজিওর ভক্ত এই ছাত্রদল ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত ছিলেন। অপর দিকে গোঁড়ামীর দুর্গ রক্ষা করছিলেন একদল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সনাতনপন্থী লোক। তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং তাঁর গঠিত ধর্ম্মসভা।

সর্ব্বসাধারণের জন্য কি ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হবে—

পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্য—এই নিয়ে মতবিরোধ চলেছিল প্রায় ১৮২২ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত। ১৮৩৫ সালে গভর্ণমেণ্ট যখন লর্ড মেকলের বিখ্যাত লিপিবদ্ধ বিবরণী গ্রহণ করলেন তখন এই বিতর্কের সমাপ্তি ঘটল। মেকলের বিবরণীতে বলা হয়েছিল যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের "মহান্ উদ্দেশ্য" হল "ভারতবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচলন করা"। অতএব পাশার দান পড়লো ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল কেটেছিল এই স্মরণীয় বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে। তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এই বাদানুবাদ খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কিন্তু তখনকার দিনের বুদ্ধিজীবিদের নূতন ভাবধারার বিপরীতেই ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠ্যব্যবস্থা গৃহীত হল। ঠাকুরদাস স্থির করলেন ছেলেকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবেন যাতে ভবিষ্যতে সে তাঁদের পৈত্রিক পেশা টোল ও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা করতে পারে। অর্থাভাবের জন্য ঠাকুরদাস নিজে এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আরও স্থির হল যে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হবেন। কারণ সেখানে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও ছিল। এই পরীক্ষায় পাশ করলে তিনি যে কোনও আদালতে হিন্দু ল অফিসার নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন।

১৮২৯ সালের জুন মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হলেন। একই বাড়ীর দুই অংশে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ অবস্থিত ছিল। এ দুটি ছিল যেন দুটি বিভিন্ন শিক্ষার জগৎ—প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য

শিক্ষা। বিদ্যাসাগরের আজীবন চেষ্টা ছিল এই দুই জগতের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করা।

তখনকার দিনে সমাজে জাতিভেদ প্রথা কতটা যে দুরূহ ছিল তা এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে। সংস্কৃত কলেজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছেলেদের প্রবেশাধিকার ছিল। স্পষ্টই বোঝা যায় এর কারণ হল আমাদের দেশের সনাতন বিশ্বাস যে একমাত্র দ্বিজদেরই প্রাচীন শাস্ত্র পড়ার অধিকার আছে। হিন্দু কলেজে মুসলমান ও খৃষ্টান ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হত না কিন্তু সব জাতের হিন্দু ছেলেদের প্রবেশাধিকার ছিল। আরও একটা কথা, দুটি কলেজ একই বাড়ির দুই অংশে অবস্থিত হলেও একটা লোহার রেলিং দিয়ে তাদের আলাদা করা ছিল। যেন দুই কলেজের ভাবধারার পার্থক্যকে বাস্তব বিভেদ দিয়ে মূর্ত্ত করে রাখা হয়েছিল। এই অর্থহীন জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা তথা জ্ঞান ও শিক্ষার উপর বাধা-নিষেধ তরুণ বিদ্যাসাগরকে নিশ্চয়ই ব্যথিত করেছিল কারণ পরে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃত্ব পেয়ে প্রথমেই তিনি এই জাতিভেদের বিধি-নিষেধ তুলে দিয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে বার বৎসরের ছাত্র জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি পেয়েছিলেন। সংস্কৃতে গদ্য ও পদ্য রচনা করেও তিনি কয়েকটি পুরস্কার পান। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হত। বিদ্যাসাগর ইংরাজীতেও ভাল ফল দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৩৫ সাল থেকে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অতএব ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরাজী শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর

হতে পারল না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। কারণ তিনি আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে মিলে ইংরাজী শিক্ষার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এক লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন।

সেকালের বাল্যবিবাহের প্রথা অনুযায়ী বিদ্যাসাগর ১৪ বছর বয়সে দীনময়ী দেবীকে বিবাহ করলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে বিবাহে তার ইচ্ছা ছিল না। বরং তিনি চিন্তা করছিলেন শিক্ষা ও জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। মনে হয় তাঁর জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে সেই তরুণ বয়সেই তিনি অস্পষ্টভাবে একটা ধারণা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বাবার একান্ত অনুরোধে বিবাহ করতে রাজী হন।

ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসর ধরে ব্যাকরণ শিক্ষা করলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন জিনিষ। ঈশ্বরচন্দ্রের মত মেধাবী ছাত্রও নিশ্চয় তা অনুভব করে থাকবেন। কিন্তু তিনি তা' বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করলেন। এইভাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা শেষ করলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রকে বাড়ীর কাজেও কঠিন পরিশ্রম করতে হত। কারণ তাঁর বাবার গৃহভৃত্য রাখার সঙ্গতি ছিল না, এবং তাঁদের কলকাতার বাসায় আরও অনেক লোক তাঁদের সঙ্গে একত্রে থাকতেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে রান্না, বাসন পরিষ্কার করা ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম করতে হত। সঙ্গে সঙ্গে সদাজাগ্রত পিতার কঠোর তত্ত্বাবধানে তাঁকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা [illegible]

ছেলের লেখাপড়ার ব্যাপারে ঠাকুরদাসের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। ফলে ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়ায় খুব মনোযোগ দেওয়ার জন্য তাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করতেও তিনি ইতঃস্তত করতেন না। মনে হয় শৈশবের এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ফলে তিনি পরবর্ত্তী জীবনে ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি দেওয়ার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের পথ খুব সহজ ছিল না। সারা জীবন তাঁকে কঠোর পরিশ্রম ও অবিরত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেই জীবনে একমাত্র আলো ছিল তাঁর অন্তরের উচ্চাশা ও ভবিষ্যতের ভরসা।

১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু ল অফিসার বা জজ-পণ্ডিতের চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করলেন। জজ-পণ্ডিতের কাজ ছিল ইউরোপীয় জজদের হিন্দু আইন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। ত্রিপুরা জেলার জজ-পণ্ডিতের কাজ ঈশ্বরচন্দ্রকে দেওয়ার কথা হল কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা তখনও শেষ হয়নি বলে তাঁর বাবার নির্দ্দেশে তিনি সে কাজ গ্রহণ করলেন না। সংস্কৃত কলেজে তাঁর লেখাপড়া চলতে লাগল। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে তাঁর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি, যে উপাধিতে তিনি পরে সমস্ত দেশে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই উপাধি সর্ব্বপ্রথম এই হিন্দু ল কমিটির সার্টিফিকেটে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তারপর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতৃদত্ত নামের চেয়ে এই উপাধির দ্বারা বেশী পরিচিত হলেন।

অবশেষে ১৮৪১ সালে সংস্কৃত শিক্ষার সকল বিষয় আয়ত্ত্ব

করে অসামান্য পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ করলেন।

মানুষের জীবনের প্রথম দিকটা হ'ল তার মানসিক গঠনের সময়। সেই দিনগুলি তার ভবিষ্যৎ বিকাশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ করে বলা যায়। সে সময় দেশ যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশের তখনকার সমাজ ছিল সংস্কারবদ্ধ ও গতিহীন। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রভাবে ও সংঘাতের ফলে সেই সমাজে একটা সঙ্কট সৃষ্টি হল। ফলে চতুর্দ্দিকে সমাজ সংস্কার ও বিপ্লবের মনোভাব ছড়িয়ে পড়ল। এই মনোভাবের মুখোমুখি দাঁড়াল গোঁড়া হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যবাদী মনোবৃত্তি। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে তখন তিনটি ভাবধারা দেখা যাচ্ছিল— পাশ্চাত্যের মোহ, সংস্কারের মনোভাব ও কঠোর গোঁড়ামী। তখনকার দিনের সচেতন বুদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট অনেক ব্যক্তির মত বিদ্যাসাগরও এই সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন এবং একটি মধ্যবর্ত্তী পন্থা বেছে নিলেন। পশ্চিমের জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যাতে রুদ্ধ না হয় এও সেই পথ।

প্রস্ফুটন

এর পর বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংস্কারক হিসাবে জীবন সুরু করলেন। তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তাঁর কাজ ছিল দেশবাসীর নৈতিক উন্নতি সাধন করা। এর জন্য সবচেয়ে কার্য্যকরী মাধ্যম ছিল শিক্ষা। সেই মাধ্যমই তিনি বেছে নিলেন।

১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরিস্তাদার বা বাংলার হেড পণ্ডিত হিসাবে কাজ সুরু করেন। ১৮০০ সালে মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলীর প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এবং পূর্ব্ব পশ্চিমের যোগসাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কোম্পানীর তরুণ বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কলেজকে কেন্দ্র করে একদল বিদ্বান লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাঁরা প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন। পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ফলে এরাঁ পশ্চিমের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অপর দিকে তাঁরা তরুণ ইউরোপীয় অফিসারদের প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শনের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে বিদ্যাসাগর কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলেজের

সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শাল। "তিনি যতই পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন ততই তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান, সাহসিকতা ও একাগ্রতা, অক্লান্ত কর্ম্মক্ষমতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁর মহৎ চরিত্র দেখে মুগ্ধ হতে লাগলেন" (শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, মডার্ণ রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। ক্যাপ্টেন মার্শালের উৎসাহে বিদ্যাসাগর হিন্দী ও ইংরাজী শিখতে আরম্ভ করলেন। শোনা যায় যে পরবর্ত্তী কালেও বিদ্যাসাগরের ইংরাজী শিখবার আগ্রহ হ্রাস পায় নি। বোঝা যাচ্ছে যে উত্তরাধিকার এবং শিক্ষাসূত্রে সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁর যে মানসিক সংযোগ ছিল তাতে ইংরাজীর মত একটা বিদেশী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মন বিরূপ হয়ে ওঠে নি। কলেজে ইউরোপীয়দের সান্নিধ্যে এসে তাঁর চিন্তাধারা আরও উদার হয়েছিল এবং তাঁর অন্তর্নিহিত সংস্কার সাধন বৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর তাঁর কৈশোরের শিক্ষাক্ষেত্র সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মার্শাল তাঁকে যে প্রশংসা পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী গুণের কথা, বিশেষ ভাবে "তাঁর কুশলতা, বুদ্ধিমত্তা এবং কুসংস্কারমুক্ত উচ্চ স্বভাব" সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। মনে হয় সংস্কৃত কলেজের এই নূতন চাকরী যে তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবে না এমন একটা আশঙ্কা বিদ্যাসাগরের মনে দেখা দিয়েছিল। হয়ত সেই কারণেই তাঁর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরীর জায়গায় তাঁর ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন যাতে নিযুক্ত হন সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন যে যদি কোনও কারণে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হয় এবং তাঁকে এই চাকরী ছেড়ে দিতে হয়, তবে তাঁর ভাইএর আয়ের দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণ হতে পারবে। সত্য সত্যই তাই ঘটেছিল।

সংস্কৃত শিক্ষা সে সময়ে পুরাণো ও গতানুগতিক ধাঁচে চলছিল। বিদ্যাসাগর একান্তভাবে সে শিক্ষার সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি একটা পরিকল্পনার খসড়া করে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্তের কাছে পেশ করলেন। মার্শাল নিজে এই খসড়াটির খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু সহকারীর রচিত খসড়া অনুযায়ী কাজ করাটা বোধহয় সেক্রেটারীর পছন্দ হ'ল না। তিনি এই পরিকল্পনার সামান্য দু'একটা বিষয় ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করলেন না।

ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষাকে যুক্তিসম্মতভাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সেইভাবে শিক্ষা লাভ করলে ছাত্ররা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে। এই কারণেই তিনি পরিকল্পনাটি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সেক্রেটারীর স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতায় বিদ্যাসাগর অত্যন্ত হতাশ হলেন। জীবনে এই প্রথম তিনি তাঁর কাজে বাধা পেলেন। ফলে তাঁর ভিতরের জেদী স্বভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন, যে প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজে শিক্ষালাভ করেছেন তার জন্য যদি প্রয়োজনীয় কাজই না করতে পারেন, তবে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জনের জন্য

ও শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে দিলেন। তখনকার দিনে মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে দেওয়া খুবই সাহস এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ ছিল। সেক্রেটারী রসময় দত্ত অবাক হলেন,—তিনি বললেন, চাকরী না থাকলে বিদ্যাসাগর নিজের খরচ চালাবেন কেমন করে! বিদ্যাসাগর সমুচিত জবাব দিয়ে বলেছিলেন বিদ্যাসাগর 'আলু পটল' বেচে খাবে। এমনি ছিল তাঁর অদম্য তেজ!

বেকার অবস্থায় বিদ্যাসাগর তাঁর মানসিক স্থৈর্য্য ও সাহস হারালেন না। কলকাতায় তাঁকে এক বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করতে হত, গ্রামেও তাঁর বাবাকে টাকা পাঠাতে হত। কারণ বিদ্যাসাগর তাঁকে ইতিপূর্ব্বেই চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করিয়ে গ্রামে বসবাস করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই দমলেন না। চাকরীতে গোলমাল হতে পারে অনুমান করে এবং নিজের সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতির কথা ভেবে বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগীতায় একটা ছাপাখানা খুলেছিলেন। এই ছাপাখানার নাম দিয়েছিলেন সংস্কৃত প্রেস। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী নামে তিনি একটা বই-এর দোকানও করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর প্রথম বাংলা বই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর এই বইটি লিখে ছাপিয়েছিলেন।

১৮৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে বিদ্যাসাগরের এই স্বেচ্ছায় বরণ-করা বেকারত্বের অবসান হয়। তিনি আবার ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজে চাকরী পান, এবারে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে।

কিছুদিন পরে আবার তাঁর কৈশোরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত কলেজে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ উপস্থিত হল। এই সুযোগের ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন এসেছিল। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হওয়াতে ডাঃ এফ্. জে. মৌয়াট বিদ্যাসাগরকে এই পদ গ্রহণ করতে বললেন। ডাঃ মৌয়াট ছিলেন শিক্ষা পরিষদের (কাউন্সিল অব্ এডুকেশান) সেক্রেটারী। তিনি বিদ্যাসাগরের খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। স্থির হল এই যে বিদ্যাসাগরকে অধ্যক্ষের মত ক্ষমতা দেওয়া হবে। বস্তুতঃপক্ষে তখন পর্য্যন্ত কলেজে কোনও অধ্যক্ষ ছিলেন না, কেবল সেক্রেটারী ও এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু পরে দু'টি পদ একত্র করে একজন অধ্যক্ষ রাখা স্থির হ'ল। ১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। সংস্কৃত কলেজের কাজকর্ম্ম কেমন ভাবে চলছে এবং কি ভাবে কলেজের আরও উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে শিক্ষা পরিষদ বিদ্যাসাগরকে একটা রিপোর্ট তৈরী করতে বললেন। সেই অনুসারে বিদ্যাসাগর রিপোর্ট দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের সেটি খুব পছন্দ হল এবং সেইকারণে তাঁকে ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজের কাজকর্ম্ম চালাবার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বিদ্যাসাগরকে দেওয়া হল।

এইভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মময়

অধ্যায় সুরু হল। তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে ক্রমে নানাদিকে বিস্তার লাভ করতে লাগল। তিনি মাত্র একটি কাজ নিয়ে কখনই ব্যাপৃত থাকতেন না। অনেকগুলি কাজ এক সঙ্গে একই সময়ে করতেন। তাঁর প্রতিভা নানাভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে লাগল।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিণী সভা' নামে একটী প্রগতিশীল সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৩ সালে ঐ সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিণী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। উদার মনোভাবাপন্ন বিদ্যাসাগর সহজাত প্রবৃত্তি বশে এই দু'টোর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি 'তত্ত্ববোধিণী পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম হলেন এবং সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন,—যদিও এই সভা ছিল ব্রাহ্মমনোভাবাপন্ন। কিছুকালের জন্য তিনি এই সভার সম্পাদক হয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর পূর্ব্বেই কাজ সুরু করেছিলেন। এদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন (বা বেথুন) বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর এই মহৎ কাজে বিদ্যাসাগরকে বিশেষ উৎসাহী সহকর্ম্মী হিসাবে পেয়েছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করে পূর্ব্বেই তিনি শিক্ষা সংস্কারের কাজ সুরু করেছিলেন, এখন সমাজ সংস্কারের কাজেও ব্রতী হলেন। তিনি বই লিখে এবং সম্পাদনা করে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজ করছিলেন। নানারকম জনহিতকর কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের অপরিসীম করুণার স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। বিদ্যাসাগর 'করুণাসাগর' বলে পরিচিত হলেন। বাংলা

সাহিত্যের নবজাগরণের প্রথম মহান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরকে এই আখ্যা দিয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য বিদ্যাসাগর যে খসড়া প্রস্তুত করেন তা থেকে তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা জানা যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত্ব করা যে কত কঠিন বিদ্যাসাগর তা বুঝতেন। তাই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ উপায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' নামে দুটি পুস্তক নিজে রচনা করলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য গণিত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। দর্শনের ছাত্রদের পাশ্চাত্য দর্শন বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব তিনি করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষাকে আবশ্যিক করার কথাও বিদ্যাসাগর বলেছিলেন।

শিক্ষা পরিষদের সমর্থন পেয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার বড় রকমের পরিবর্ত্তন করতে সুরু করলেন। কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার ব্যাপারে যে জাতিগত নিষেধাজ্ঞা ছিল সর্ব্বপ্রথমে তিনি তা দূর করলেন। তখনও পর্য্যন্ত কলেজে প্রবেশ মূল্য বা মাসিক বেতন নেওয়া হত না। বিদ্যাসাগর এই দু'টো ব্যবস্থাই চালু করলেন, যাতে ছাত্রেরা লেখাপড়ার উপর যথেষ্ট গুরত্ব দেয়। তিনি ইংরাজী শিক্ষাকে আবশ্যিক করলেন ও আধুনিক গণিত শিক্ষার প্রবর্ত্তন করলেন। তখনও পর্য্যন্ত ছাত্র বা শিক্ষক কেউই নিয়মিত ও সময়মত কলেজে আসতেন না। বিদ্যাসাগর কড়া নিয়ম করে দিলেন যে সকলকে নিয়মিত ও সময়মত কলেজে আসতে হবে।

এ বিষয়ে কয়েকটি মজার গল্প আছে। কলেজের

শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই একদিন বিদ্যাসাগরের শিক্ষক ছিলেন, কারণ বিদ্যাসাগর একদা এই কলেজেই পড়াশুনা করেছিলেন। কাজেই তাঁরা বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে বড় ও চাকরীতে পুরানো ছিলেন। ফলে তাঁদের তিরস্কার করতে বিদ্যাসাগরের সঙ্কোচ বোধ হত। তাই তিনি এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন। শিক্ষকরা দেরী করে এলে তিনি তাঁদের একটাও কড়া কথা বলতেন না, শুধু কলেজের প্রধান দরজার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। যখনই দেখতেন কোনও শিক্ষক দেরীতে আসছেন তখনই তাঁর কাছে গিয়ে খুব সরলভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, "আপনি কি এই মাত্র এলেন ?" শিক্ষকেরা লজ্জা পেয়ে নিজেদের সংশোধন করতেন। কিন্তু জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নামে একজন শিক্ষক ছিলেন সংশোধনের অতীত। তিনি কোনমতেই ঠিক সময়ে উপস্থিত হতেন না। বিদ্যাসাগর এঁর জন্য একটা ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করলেন। দিনের পর দিন দেরী করে আসা জয়নারায়ণের জন্য গেটের কাছে অপেক্ষা করতেন। একটা কথাও উচ্চারণ করতেন না, কেবল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝিয়ে দিতেন যে তিনি জয়নারায়ণের দেরী করে আসা লক্ষ্য করছেন। এর ফল ভাল হল। জয়নারায়ণ তাঁর অন্যায় বুঝতে পারলেন এবং সময়মত আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বিদ্যাসাগর যে নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত কলেজের কাজ পরিচালনা করতে লাগলেন তাতে দিন দিন কলেজের উন্নতি হতে লাগল।

১৮৫৩ সালে একটা বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বিদ্যাসাগরের পক্ষে তা সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু

সৌভাগ্যক্রমে তা হয় নি। শিক্ষা পরিষদ বিদ্যাসাগরের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জে. আর. ব্যালেনটাইনকে আহ্বান করলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের কাজকর্ম্ম দেখে একটি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ব্যালেনটাইন সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরের কার্য্যাবলী সমর্থন করলেন। তবে কয়েকটি বিষয়ে তিনি কিছু মন্তব্য করলেন। বিষয়গুলি তত জরুরী নয়, কিন্তু বিদ্যাসাগর তার জবাব যা দিলেন সেইটাই হল গুরুত্বপূর্ণ।

মিলের 'লজিক' বা তর্কশাস্ত্রের একটা সরল সারাংশ ব্যালেনটাইন নিজে লিখেছিলেন। তিনি সেই পুস্তকটি কলেজের পাঠ্য করার প্রস্তাব করলেন। ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র এবং মিল লিখিত পুস্তকের মধ্যে পরিভাষার সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা তিনি এই পুস্তকে করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রস্তাবটি বাতিল করে দিলেন, কারণ তাঁর মতে ছাত্রদের মূল পুস্তক পড়তে উৎসাহিত করা উচিৎ। এ ছাড়া ব্যালেনটাইন বিশপ বার্কলে রচিত 'এনকোয়ারার' নামে দর্শনের পুস্তকটি দর্শন ক্লাশের পাঠ্য করার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সে প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে 'সাংখ্য' ও 'বেদান্ত' যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে বার্কলেও প্রায় সেই সিদ্ধান্ত করেছেন। 'সাংখ্য' ও 'বেদান্ত' হিন্দুদের কাছে যত পবিত্রই হোক না কেন সেগুলি সুযুক্তিপূর্ণ বা অভ্রান্ত নয়। অতএব ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে যা শিক্ষা করছে আবার তাদের তার ইংরাজী সংস্করণ শিক্ষা দেওয়া নিরর্থক।

ব্যালেনটাইন বরং প্রাচীন ভারতের বিদ্যাবত্তার পক্ষপাতী

ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। তাঁর দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে প্রসারিত। পশ্চিমের নূতন জ্ঞানের আলোক গ্রহণ করতে তিনি একান্ত ভাবে উৎসুক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সনাতন ভারতীয় বিদ্বান সমাজের তীব্র বিরুদ্ধতা করে বলেন, "ভারতীয় বিদ্বান সমাজকে ইউরোপের অগ্রগামী বিজ্ঞান গ্রহণ করানো এক অসম্ভব ব্যাপার।" তিনি বললেন, "তাঁরা (ভারতীয় সনাতনী পণ্ডিতেরা) এমন একদল লোক যাঁদের দীর্ঘদিনের কুসংস্কার কিছুতেই দূর করা যাবে না। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের কাছ থেকে পাওয়া, অতএব সে শাস্ত্র অভ্রান্ত না হয়ে পারে না……এই সব লোকের আনুকূল্যে আমাদের প্রয়োজন নেই, কেন না তাঁদের কোনও রকম সাহায্য আমরা চাই না। এঁদের বিরুদ্ধতাকে আমাদের ভয় করার কোনও কারণ নেই, কেননা এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যেতে আরম্ভ করেছে।"

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিদ্যাসাগর জোর দিয়েছিলেন। সেটি হল জনশিক্ষা। তিনি মনে করতেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জনগণের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হবে। তিনি বলেছিলেন, "অনুমান হয় বাংলা দেশের লোকেরা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য খুব উৎসুক……অতএব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপনা ও প্রয়োজনীয় নীতিমূলক কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করার প্রয়োজন। শিক্ষকতা করার জন্য উপযুক্ত একদল শিক্ষক তৈরী হলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

যুক্তিবাদী, মানবদরদী ও জনশিক্ষক বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি এই কথা থেকে বোঝা যায়। তিনি যে কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার বিরুদ্ধে অভিযান করতে চেয়েছিলেন তাও জানা যায়। অতীত যতই গৌরবময় হোকনা কেন তিনি আর পিছনের ডাক শুনতে চাইলেন না। ভবিষ্যতের নূতন আলোককে তিনি স্বাগত জানালেন।

এ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে যা স্থায়ী ও মহান তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর নূতন ভাবধারার মিলন ঘটাতে চাইলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যা নূতন যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারবে। সংস্কৃত বা ইংরাজীর মধ্যে কোনও একটিকে নিয়ে তা সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন দুটি শিক্ষাধারার উপযুক্ত সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।

প্রথম দিকে শিক্ষা পরিষদ ব্যালেনটাইনের অভিমতের প্রতি আকৃষ্ট হলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা বিদ্যাসাগরের যুক্তি মেনে নিলেন এবং তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অনুমতি দিলেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের বেতন বাড়িয়ে তিনশত টাকা করে দিলেন। ক্রমশঃ কলেজের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসাররা বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতে লাগলেন। সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজ ও উঠতি মধ্যবিত্ত সমাজ উভয়েরই শ্রদ্ধা বিদ্যাসাগর অর্জ্জন করলেন।

১৮৫৩-৫৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র কয়েকটি মূল্যবান সাহিত্য বিষয়ক কাজ করেছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' সম্পাদনা করেছিলেন। এ ছাড়া 'রঘুবংশ' ও কীরাতার্জ্জুনিয়মও সম্পাদনা করেছিলেন।

তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ও 'শকুন্তলা' রচনা করেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগরের আর একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হল নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই বিদ্যালয়ের সব ব্যয় তিনি নিজে বহন করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, নিজের বাড়ীতে নিজের খরচে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর চরিত্রের মানবদরদী দিক ক্রমেই প্রকাশিত হতে লাগল। তাঁর অন্তরের অপার করুণা নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে মানুষের দুঃখ ও অজ্ঞতা দূর করতে লাগল।

ইতিমধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন হল। ১৮৫৪ সালের প্রথম দিকে নূতন গঠিত পরীক্ষক সংসদ (বোর্ড অব্ একজামিনারস) ফোর্ট উইলিয়মের কলেজের স্থান গ্রহণ করল। বিদ্যাসাগর এই সংসদের সদস্য হলেন। ১৮৫৪ সালের 'এডুকেশান ডেসপ্যাচ' অনুসারে 'কাউন্সিল অব এডুকেশান' এর পরিবর্ত্তে একটা শিক্ষা বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট অব্ এডুকেশান) গঠিত হল। গর্ডন ইয়ং নামে একজন অনভিজ্ঞ সিভিলিয়ান জনশিক্ষা অধিকর্ত্তা (ডাইরেক্টার অব্ পাবলিক ইনসট্রাকশান) নিযুক্ত হলেন। এঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক খুব ভাল হল না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হলে, বিদ্যাসাগর তার অন্যতম সদস্য হলেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বিদ্যাসাগর তার 'ফেলো' বা সদস্য নিযুক্ত হলেন।

দীপ জ্বেলে দাও

বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। দেশবাসীদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার কঠিন ব্রত তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার আগে থেকেই তাঁর অন্তরে এই ইচ্ছা জেগেছিল। অধ্যক্ষ হওয়ার পর তাঁর আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল।

সরকার মেকলের শিক্ষাসংক্রান্ত বিবরণী গ্রহণ করে শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দিতে সুরু করলেন. মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা অবহেলিত হচ্ছিল। অথচ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন। জাতির পুনর্গঠনের জন্য এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর বিশেষ সচেতন ছিলেন তাই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ছিলেন তখন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে উৎসাহী হন। মার্শালও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে ১০১টি পাঠশালা স্থাপন করেন। এই পাঠশালাগুলি হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় নামে পরিচিত ছিল। নানা কারণে এই বিদ্যালয়গুলি ভালভাবে চলে নি। নানা কারণের মধ্যে একটা হল উপযুক্ত শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব।

দশ বছর পরে আবার এ বিষয়ে নূতন করে চিন্তা সুরু হল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মিঃ টোমাসন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা করে ভাল ফল পান। তাই ভারত সরকার ও বাংলা সরকার আর একবার এ বিষয়ে চেষ্টা করে দেখবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই কাজে জনশিক্ষক হিসাবে বিদ্যাসাগর আবার শিক্ষা প্রসারের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

ব্যালেনটাইনের রিপোর্টের উপর বিদ্যাসাগর যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে তিনি পাঠশালা স্থাপনের, বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনার ও একদল শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অতএব শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা গভর্ণমেণ্টের জানা ছিল।

১৮৫৩ সালে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কাজ সুরু করবার তাগিদ দেখা গেল। প্রথমে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সদস্য হিসাবে এবং পরে ১৮৫৪ সালে বাংলা দেশের প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর হিসাবে এফ, জে, হ্যালিডে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে এই কাজের ভার গ্রহণ করলেন। হ্যালিডে ছিলেন বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত গুণগ্রাহী। তিনি ভারত সরকারের কাজে একটি সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী পাঠালেন। তাতে তিনি অনেকগুলি মাতৃভাষা মাধ্যমে আদর্শ পাঠশালা স্থাপন করার এবং মাঝে মাঝে সেগুলি পরিদর্শন করার প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবের মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা, কারণ হ্যালিডে তাঁর সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রচিত একটি স্মারকলিপি সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। ঐ স্মারকলিপিতে তাঁর পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ছিল। "সংস্কৃত কলেজের উৎসাহী ও উপযুক্ত অধ্যক্ষের রচিত পরিকল্পনাটির প্রতি

হ্যালিডে শুধু যে সাধারণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে এই "অসাধারণ ব্যক্তিটির" অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের উপর ব্যক্তিগতভাবে এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের ভার দেওয়া হোক। হ্যালিডে সত্য সত্যই মনে করতেন, এই কাজে বিদ্যাসাগরের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু কেমন করে বিদ্যাসাগর এ কাজের ভার নেবেন? তখনও তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বহাল ছিলেন এবং সে দায়িত্ব থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব একসঙ্গে দুটি পদের কার্য্যভার তাঁকে কেমন করে দেওয়া যায়? অনেক চিন্তা করা হল। যেমন, তিনি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলি মাঝে মাঝে পরিদর্শন করবেন অথবা তাঁকে বিদ্যালয়গুলির অস্থায়ী পরিদর্শক নিযুক্ত করা, ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিল। উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং নামে একজন নূতন ও অনভিজ্ঞ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী জনশিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তা (ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশান) নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই নিয়োগের ফলে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেছিল।

বিদ্যালয় স্থাপনার কাজে বিদ্যাসাগরকে নিয়মসঙ্গতভাবে গ্রহণ করার জন্য হ্যালিডের একান্ত আগ্রহ শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হল। ১৮৫৫ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগরকে সহকারী পরিদর্শক এবং পরে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হ'ল। এই কাজের জন্য তিনি দু'শো টাকা অতিরিক্ত বেতন পেতে লাগলেন। তাঁর মোট আয় হল পাঁচ শত টাকা।

অশিক্ষার অন্ধকার দূর করার দুরূহ কাজে বিদ্যাসাগর ধর্ম্মপ্রচারকের মত উৎসাহী হয়ে উঠলেন। প্রথমেই যে জিনিষটায় তিনি বাধা পেলেন তা হল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। তখন হিন্দু কলেজের সঙ্গে একটা পাঠশালা সংযুক্ত ছিল। এই পাঠশালাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগর একটা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগর একসঙ্গে তিনটি দায়িত্ব গ্রহণ করেন,—সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখাশুনা করা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের পরিচালনা এবং তাঁর এলাকাধীন জেলাগুলিতে কতকগুলি আদর্শ পাঠশালা স্থাপন। অসামান্য কর্ম্মক্ষমতা ছিল বলে বিদ্যাসাগর এই তিনটি দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করতে পেরেছিলেন।

কলেজের দীর্ঘ ছুটির অবকাশে বিদ্যাসাগর দূরের গ্রামে চলে যেতেন এবং আদর্শ পাঠশালা স্থাপন করা বা তার দেখা-শুনা করতেন। তাঁর এলাকাধীন জেলাগুলির প্রত্যেক জেলায় তিনি পাঁচটি করে মোট কুড়িটি পাঠশালা স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তারের এই নূতন ভাবধারায় গ্রামবাসীরাও উৎসাহিত হয় এবং পাঠশালা গৃহ নির্ম্মাণের ভার নিজেরা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর না দিয়ে বা শারীরিক কষ্টকে গ্রাহ্য না করে বিদ্যাসাগর অক্লান্তভাবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পাল্কীতে চড়ে বা পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়ের করুণ পরিণতির কথা তাঁর মনে ছিল। তাই তিনি তাঁর স্থাপিত পাঠশালাগুলিকে সফল করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। প্রাণ-পণ পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে

শিক্ষা পদ্ধতির বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন। এই পদ্ধতির অনেক রূপান্তর হয়েছে, কার্য্যক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ আরও হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণের মনে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করার আগ্রহ বিদ্যাসাগরই সর্ব্ব-প্রথম জাগিয়ে তোলেন। আজ থেকে একশত বছর আগে দেশে যখন শিক্ষার প্রসার ছিল না তখন তিনি শিক্ষানুরাগের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন গ্রামাঞ্চলে যেতেন তখন তিনি সেখানকার লোকেদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে তাদের অর্থ ও অন্যান্য হরেকরকমের সাহায্য করতেন। আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দানও বেড়ে গিয়েছিল। অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন লোকেদের জন্য তাঁর অর্থভাণ্ডার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। ক্রমে তাঁর নাম যাদুমন্ত্রের মত ছড়িয়ে পড়লো। যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই এই করুণার সাগরকে দেখবার জন্য লোকেরা ভিড় করে আসত।

বিদ্যাসাগর বিরাম বা বিশ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর অপরাজেয় আদর্শবাদ ছিল, শিক্ষার জন্য আগ্রহও ছিল অসামান্য। কেবল ছাত্রদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে তিনি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে চেষ্টা করার সুযোগ এলো। ডেভিড হেয়ার ছেলেদের শিক্ষার জন্য যা করেছিলেন, জে. ই. ডি. বেথুন মেয়েদের শিক্ষার জন্য তার অনুরূপ প্রচেষ্টা সুরু করেন। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কিছু চেষ্টা এর আগেও

হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে বেথুনই বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ক্রমে সেই বিদ্যালয়টি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বিদ্যালয়টির নামকরণ বেথুনের নামে হয়েছিল। বাংলাদেশের নারীজাতির মধ্যে থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকের মত বেথুনের এই উৎসাহে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিরা তাঁদের অকৃপণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হলেন।

১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর গভীর আঘাত পেলেন। ফলে তিনি বেথুনের কাজে এবং বেথুনের শিক্ষায়তনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করলেন। বিদ্যালয়টির দায়িত্বভার গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করলেন এবং ভারত সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারী সিসিল বীডনকে সভাপতি করে একটা কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটি বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম তদারক করতে লাগলেন। বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে লাগলেন। মনুসংহিতা থেকে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের গাড়ী ও পাল্কীর গায়ে লিখিয়ে দিলেন। শ্লোকটির অর্থ হল পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তারাও শিক্ষার অধিকারী। সাধারণের মনে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধ সঞ্চার করার জন্য বিদ্যাসাগর এই শ্লোকটি লিখিয়েছিলেন। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম চালাতেন। ১৮৬৯ সালে এই কমিটি ভেঙে দেওয়ার আগে পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উড শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিবরণী দেন তাতে তিনি স্ত্রী শিক্ষা সমর্থন করেন। ফলে বহুদিনের অবহেলিত স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার একটা নূতন আশা দেখা দিয়েছিল। লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর হ্যালিডে এই ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বেথুন যেখানে তাঁর কাজের সূত্র ছেড়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে সূত্র ধরে বিদ্যাসাগর কাজটিকে আরও বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। হ্যালিডের কাছ থেকে মৌখিক নির্দ্দেশ পেয়ে ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকার জেলাগুলিতে ছেলেদের আদর্শ পাঠশালার মত মেয়েদের জন্যও পাঠশালা স্থাপন করতে উদ্যোগী হলেন। তাঁর আশা ছিল ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ও আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে।

ছেলেদের শিক্ষার তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা কঠিন ব্যাপার ছিল। তাছাড়া এ কাজ বিশেষ সতর্কভাবে করার দরকার ছিল। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে কঠিন বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হ'ল। বহুযুগের সঞ্চিত কুসংস্কার স্ত্রী শিক্ষাকে যুক্তিহীনভাবে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। অশিক্ষার অন্ধকারে কেবলমাত্র গৃহস্থালীর কাজ নিয়ে স্ত্রীলোকেরা জীবন কাটাতে বাধ্য হতেন। এই কঠিন সমাজ ব্যবস্থার ফলে চিরকালের মত স্ত্রীলোকদের হীন বলে মনে করা হত। এই বদ্ধমূল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ ছিল না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় দৃঢ় বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন সমাজের অগ্রগতির জন্য স্ত্রী শিক্ষা অপরিহার্য্য। যেখানে সম্ভব সেখানে বালিকা বিদ্যালয়

স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার নানাবিধ সুফলের কথা প্রচার করতেন। এই মহৎ কাজের জন্য তাঁকে যথেষ্ট সমালোচনা, বিরুদ্ধতা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। সমাজের গোঁড়াপন্থীরা বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার নিন্দা করতে লাগলেন। তাঁদের মতে স্ত্রী শিক্ষায় নারীত্বের অবনতি হয়। তাঁরা বিদ্যাসাগরের মাথায় নিন্দার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর অদম্য। নারীশিক্ষার প্রসার যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা সকলের মনে জাগ্রত করবার জন্য বিদ্যাসাগর অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর একটির পর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন। তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে গভর্ণমেণ্ট এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। এগুলির ছাত্রী সংখ্যা ছিল তেরশো। এই বিদ্যালয়গুলি ছিল অবৈতনিক, এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় লোকেরা বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় বহন করেছিল। কিন্তু মাসিক খরচ চালানোর জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় স্থাপনের পর বিদ্যাসাগর জনশিক্ষা অধিকর্ত্তাকে খবরটি জানিয়ে দিতেন এবং সরকারী সাহায্যের সুপারিশ করতেন। ১৮৫৪ সালে উড সাহেব গভর্ণমেণ্টের কাছে যে রিপোর্ট দেন তাতে তিনি স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করেন এবং অর্থ সাহায্য করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত সরকার সাহায্যদানের যে নিয়ম ছিল তা বদল করে বালিকা

বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ দিতে অস্বীকার করলেন। সরকার থেকে বলা হল যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জনসাধারণ যদি বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য না করে তবে এমন বিদ্যালয় না রাখাই ভালো। নারী শিক্ষার প্রতি সরকার চরম উদাসীনতা দেখালেন। বিদ্যাসাগর গভীর আঘাত পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে প্রদীপ তিনি জ্বালিয়েছিলেন তা নিভে যাবে। অন্ধকার অঞ্চল আরও অন্ধকার হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ের জন্য নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন,—এই ব্যয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। সরকারী সাহায্য না পাওয়া গেলে হয়ত তাঁকে নিজে ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

বিদ্যাসাগর বারংবার অনুরোধ জানিয়ে বিফল হলেন। হ্যালিডে সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বিরূপতার জন্য তিনি নিরুপায় বোধ করতে লাগলেন। এমন কি তিনি প্রস্তাব করলেন বিদ্যাসাগর যেন এই টাকা আদায়ের জন্য আদালতে তাঁর নামে মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন মহানুভব ব্যক্তি; তাঁর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব ছিল না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে সরকারের প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল। অতএব সরকার আর স্ত্রী শিক্ষার মত মহৎ কাজের জন্যও অর্থ ব্যয় করতে রাজী হলেন না। অবশেষে সরকার সে পর্য্যন্ত নারীশিক্ষার জন্য যতটুকু ব্যয় হয়েছে তা দিতে রাজী হয়ে বিদ্যাসাগরের ভার কিছু লাঘব করলেন কিন্তু এর দ্বারা স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখানো হল না।

বিদ্যাসাগর এই ঘটনায় কতটা হতাশ হয়েছিলেন

তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করার লোক তিনি ছিলেন না। এই বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিদ্যাসাগর সাধারণ একটা অর্থভাণ্ডার স্থাপন করলেন। এই ভাণ্ডারে শুধু যে বিশিষ্ট ভারতীয়েরাই চাঁদা দিলেন তাই নয়, সিসিল বিডনের ন্যায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং এমন কি লেডী ক্যানিং পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

যে মহৎ উদ্দেশ্যে সাধনের ব্রত তিনি নিয়েছিলেন তা কিছুকালের জন্য থেমে গেল সন্দেহ নেই। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এই আপোষহীন সংগ্রামের ফলে তিনি সমাজে এক নূতন আলো এনে দিলেন। দেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে অবিনশ্বর এক যুগ-সূচনার স্বাক্ষর হয়ে আছে বিদ্যাসাগরের এই অপরাজেয় সংগ্রাম।

সাল তারিখের হিসাবে অনেক পরের ঘটনা হলেও তার উল্লেখের প্রয়োজন আছে। কারণ এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে যে, বিদ্যাসাগর তাঁর সুচিন্তিত সংস্কারের কাজ প্রচণ্ডবেগে চালিয়ে যেতে চাইলেও তাঁর সেই উৎসাহের অপপ্রয়োগ করেন নি; প্রয়োজনমত তাঁর সহজাত বাস্তব-বাদী মন তাঁকে এক এক জায়গায় নিরস্ত করেছিল। ভারতের বন্ধু ও মানবজাতির কল্যাণকামী মিস মেরী কার্পেণ্টার নামে এক মহিলা ১৮৬৬ সালের শেষের দিকে ভারতে আসেন এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার দেখে তিনি উৎসাহবোধ করেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করেন যে বেথুন

স্কুলের সঙ্গে শিক্ষিকা-প্রশিক্ষণের জন্য একটা নর্মাল স্কুল খোলা হোক। স্বভাবতঃ এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমত চাওয়া হল। কিন্তু এবারে তিনি বিপরীত মত দিলেন। বিদ্যাসাগর বললেন, নারী শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই পরিকল্পনাটি যোগ্য বলে সুপারিশ করতে পারছেন না। কারণ তা হলে জনমতের খুব বেশী রকম বিরুদ্ধাচরণ করা হবে এবং শেষে এটা বিফল হবে। তিনি জানতেন যে সমাজ কুসংস্কারে এত অন্ধভাবে আবদ্ধ যে কেউই তার বাড়ীর বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে শিক্ষিকা-প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাবেন না। অবিবেচনা ও অতি উৎসাহের ফলে একটা মহৎ উদ্দেশ্য যাহাতে নষ্ট না হয়ে যায়, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর বিশেষ সতর্ক ছিলেন। নারীশিক্ষার ব্যাপারে তিনি একান্ত আগ্রহশীল ছিলেন বলে তিনি বিশেষ সতর্কভাবে এ কাজে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নির্ভুল। নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল বটে কিন্তু বেশী দিন চলল না।

কলকাতায় মিস কার্পেণ্টারের অবস্থিতি কালে বিদ্যাসাগরের জীবনে একটি দুঃখপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। মিস কার্পেণ্টার মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় দেখতে যেতেন। তাঁর অনুরোধে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে যেতেন। একবার বালি থেকে দু'টি পৃথক গাড়ী করে তাঁরা দু'জনে উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় দেখতে যাচ্ছিলেন। পথে বিদ্যাসাগরের গাড়ীটা দুর্ঘটনায় পড়ে উল্টে যায়। বিদ্যাসাগর গুরুতর আঘাত পান এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। সে সময় মিস কার্পেণ্টার মায়ের মত

শুশ্রূষা করে কিভাবে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন সে কথা তিনি জীবনের শেষ ভাগেও স্মরণ করতেন। পড়ে গিয়ে বিদ্যাসাগরের লিভারে যে আঘাত লেগেছিল, সারা জীবনেও আর তা ভাল হয়নি।

পতিহীনাদের সমর্থনে

বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ছিল বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করা। তিনি যদি আর কোন প্রশংসনীয় কাজ নাও করতেন, তবু শুধু এই একটা মাত্র কাজের জন্য তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকতো।

আধুনিক ভারতের সমাজ সংস্কারের কাজ সুরু করেন রাজা রামমোহন। ন্যায্যতঃই তাঁকে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তির কাজে তাঁর ভূমিকাই প্রধান ছিল। আবার তিনিই ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্ত্তক,—যে ব্রাহ্ম সমাজ কয়েক দশক ধরে দেশে সবরকম প্রগতির কাজে শীর্ষভাগে ছিল। যখন সতীদাহের মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয় তখন বিদ্যাসাগর মাত্র আট-নয় বৎসরের বালক। তিনি তখনও কল্পনাও করতে পারেন নি যে, রামমোহনের কাজ যেখানে শেষ হবে ইতিহাসের এই আশীষ-ধন্য বালক সেখান থেকে সুরু করবেন আর এক কর্মপ্রচেষ্টার অধ্যায়।

তখন সমাজের মধ্যে সংস্কারের ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছিল এই সব বাধ্যতামূলক বৈধব্য ও বহু বিবাহের সমস্যার সমাধান নিয়ে। রামমোহনের তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী মনে তা ইতিপূর্ব্বেই উদয় হয়েছিল। মনে হয় এ সমস্যাগুলি নিরসনের জন্য যথেষ্ট সময় তিনি পান নি। পরে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ডিরোজিওর একদল ছাত্র এ বিষয়ে আলোচনা সুরু করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে বাংলাদেশের শিক্ষিত ও বিশিষ্ট সম্প্রদায় এই সামাজিক

কুপ্রথা সম্বন্ধে খুব সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। কুপ্রথাগুলি বিলোপ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে তাঁরা অনেক আলোচনা বিতর্ক করছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ছিল বিগত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের দুটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। এই দু'টির প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং রামমোহন যে সমাজ সংস্কারের কাজ সুরু করেছিলেন তাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন কঠোর যুক্তিবাদী মানুষ ও শক্তিশালী গদ্য লেখক। সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি বিদ্যাসাগরের বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী ছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা ছিল ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান। বিদ্যাসাগর এই সভার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং কিছুকালের জন্য তার সম্পাদক হন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ছাপা হয়। বিদ্যাসাগরের এক জীবনীকারের অভিমতে, আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ না করলেও তাঁর মনোভাব ছিল ব্রাহ্মদের মত। সে সময়ে সমাজ যে রকম কুসংস্কারপূর্ণ ছিল তাতে বিদ্যাসাগরের এই প্রগতিশীল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সত্যই প্রশংসার যোগ্য। বিদ্যাসাগরের মনের স্বাভাবিক উদারতার সঙ্গে মিশেছিলো তত্ত্ববোধিনী দলের প্রগতিবাদের চিন্তাধারা।

অতএব প্রগতিবাদী শিক্ষিত লোকের কাছে ইতিমধ্যেই বিধবা বিবাহের প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিল। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টা সুরু করার আগেই বাল-বিধবাদের

পুনর্বিবাহের জন্য প্রয়াস করা হয়। কিন্তু সমাজের প্রবল বিরুদ্ধতার জন্য তা সফল হয় নি।

বিদ্যাসাগর দুটি কঠিন সমস্যার সামনে এসে দাঁড়ালেন,— এক দিকে সংস্কারবাদের তরঙ্গ, অন্যদিকে কঠোর গোঁড়ামী। পথ বেছে নেওয়া সহজ ছিল না। প্রগতির পথ নেবেন কি প্রগতিবিরোধের পথ নেবেন! বিদ্যাসাগর প্রথম পথটাই বেছে নিলেন। তিনি স্থির করলেন যে, বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত সে কথা তিনি প্রমাণ করবেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত অনেকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। তার একটা হল এই যে, বিদ্যাসাগরের মা নিজেই তার কাছে বিধবাদের পুনর্বিবাহের চেষ্টা করার নির্দেশ দেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ উদারমনা মহিলা। গোঁড়া মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের বাবাও বিদ্যাসাগরকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অপর একটা কাহিনী অনুসারে, বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের গ্রামের এক বাল্য-সঙ্গিনী বাল-বিধবার দুঃখ দেখে গভীরভাবে অভিভূত হন তের-চোদ্দ বছরের বালক বিদ্যাসাগর যখন শুনলেন তার বাল্য-সঙ্গিনী বিধবা বলে মাঝে মাঝে উপবাস করতে বাধ্য হন তখন তিনি কান্নায় ফেটে পড়লেন। বিশেষ কোনও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল না, কারণ চারিদিকে অনেক বাল-বিধবা ছিল এবং তাদের দুঃসহ জীবন বিদ্যাসাগর নিজের চোখে দেখেছিলেন। এছাড়া বিদ্যাসাগরের অন্তরে ছিল সমাজ সংস্কারের প্রবল অনুরাগ।

আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার ফলে দেশে

বিধবাদের সংখ্যা খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল। তখন বাংলা-দেশে কৌলিন্যপ্রথা বলে একটা প্রথা ছিল। এরজন্যও বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৌলিন্যপ্রথা জাতি-প্রথার একটা রূপ। দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের রাজা বল্লাল সেন ব্যক্তিগত গুণানুসারে ব্রাহ্মণদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। বল্লাল সেনের মতে ব্রাহ্মণদের নয়টি গুণ থাকা উচিৎ। যে সব ব্রাহ্মণের সব কয়টি গুণ আছে তাহাদের কুলীন নামে অভিহিত করেন। তখনকার দিনে কুলীনদের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিবাহের কোনও বাধা-নিষেধ ছিল না। এমন কি কুলীনের সঙ্গে অ-কুলীনের বিবাহও হত। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল কুলীন প্রথার পবিত্রতা রক্ষা করা। এই শ্রেণীর দেবীবর ঘটক (পঞ্চদশ শতাব্দী) নামে এক ব্রাহ্মণ কুলীনদের ছত্রিশটি বিভাগে বিভক্ত করে নির্দেশ দিলেন যে এই ছত্রিশটি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণেরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করবেন। প্রথমে কৌলিন্য ছিল ব্যক্তিগত সম্মানের চিহ্ন। পরে তার অবনতি ঘটে। কুলীনের সন্তান হলেই তার কৌলিন্যের অধিকার জন্মাত, উপরোক্ত নয়টি গুণের একটি গুণ না থাকলেও। এই কৌলিন্য প্রথাই নিষ্ঠুর নারী নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। উচ্চবর্ণের পিতা-মাতাদের কুলীন পাত্রে কন্যা দান করার বাধ্যবাধকতা থাকায় বিবাহের বাজারে কুলীন পাত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী হয়ে গেল। এর ফলে বিবেকহীন কুলীনদের এক লাভজনক ব্যবসা চালানোর সুবর্ণ সুযোগ মিলে গেল। তাঁরা অনেকগুলি বিবাহ করতে সুরু করলেন এবং তা কেবলমাত্র পয়সার

জন্য। লৌকিক প্রথা অনুযায়ী কন্যাদের ঋতুমতী হওয়ার আগেই বিবাহ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় পিতামাতারা ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। সময়মত উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেলে সামাজিক নির্যাতনের ভয়ে তাঁরা যে কোনও কুলীন পাত্রেই কন্যা দান করতেন ; এমন কি তার যদি ডজনখানেক স্ত্রী থাকতো তবুও। সত্তর আশী বছরের বৃদ্ধের হাতে বিবাহের নামে কন্যা বিসর্জ্জন দেওয়া হতে লাগল। অনেক সময় বিবাহের ঠিক পরেই তাদের মৃত্যু হত এবং তাদের বাল-বিধবা পত্নীরা সারাজীবন দুঃখ ক্লেশ ভোগ করতেন। যে সব কুলীনরা বহু বিবাহ করতেন, স্ত্রীদের ভরণপোষণের কোনও আর্থিক দায়িত্ব তাঁরা নিতেন না। বরং তাঁরা কন্যার পিতামাতাকে সামাজিক নিন্দার হাত থেকে রক্ষা করেছেন এই অজুহাতে তাদের কাছ হতে অর্থ আদায় করতেন। বালিকা নির্যাতনের করুণ কাহিনীর সাক্ষ্য-স্বরূপ অনেক লিখিত বিবরণী আছে। কথিত আছে যে, কুলীনরা এত সংখ্যক বিবাহ করতেন যে তাঁদের সকল স্ত্রীকে তাঁরা চিনতেন না, এমন কি কয়েক বৎসরের মধ্যেও তাদের সকলের সঙ্গে একবার দেখা করবার সুযোগ বা সময় পেতেন না। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি নামে বিদ্যাসাগরের একজন শিক্ষক বৃদ্ধ বয়সে একটি বালিকাকে বিবাহ করেন। তাতে বিদ্যাসাগর এত ক্রুদ্ধ হন যে, প্রতিজ্ঞা করেন তিনি জীবনে কখনও ঐ শিক্ষকের বাড়িতে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করবেন না। বলা বাহুল্য, ঐ শিক্ষকের অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয় এবং তাঁর বালিকা বধুটি বেঁচে থাকেন।

অতএব বিদ্যাসাগর বাধ্যতামূলক বৈধব্যদশার মত একটি

নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এটা ছিল মানবিক সমস্যা। কারণ সমস্ত জীবনব্যাপী ব্রহ্মাচর্য্য ও দুঃখদৰ্দ্দশার সঙ্গে এই সমস্যাটি জড়িত ছিল। বিদ্যাসাগর গভীরভাবে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিধান অন্বেষণ করতে লাগলেন। তিনি বাস্তববাদী ছিলেন বলে হিন্দুশাস্ত্রের মতবাদের বাইরে যেতে চাইলেন না, কারণ তা হলে সমসাময়িক সমাজ সেই আমূল পরিবর্ত্তন গ্রহণ করবে না। হিন্দুশাস্ত্রের পরিধির মধ্যে থেকেই তিনি এই সমাধান খুঁজে বার করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কাছে তা গ্রহণযোগ্য প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। গভীর অধ্যয়ন এবং গবেষণার পর তিনি পরাশর সংহিতার মধ্যে একটি শ্লোকের সন্ধান পেলেন। এই শ্লোকের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, কোনও কোনও অবস্থায় বিধবার পুনর্বিবাহের অনুমতি শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। পরাশরের মতে সহমরণ ও আজীবন ব্রহ্মাচর্য্য অবশ্যই পুণ্যের কাজ। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে "স্বামীর সংবাদ বহুদিন পর্য্যন্ত না পেলে, স্বামীর মৃত্যু হলে বা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে বা ক্লীব প্রমাণিত হলে অথবা অধঃপতিত হলে" স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করতে পারে। বিদ্যাসাগর যুক্তি দেখালেন যে যখন সতীদাহপ্রথা আইন করে বন্ধ করা হয়েছে এবং যখন কলিযুগে আজীবন ব্রহ্মাচর্য্য পালন করা স্ত্রীলোকদের পক্ষে কঠিন তখন তৃতীয় পন্থা, অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের দ্বিতীয়বার বিবাহের বিধান শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। অতএব বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। কলিযুগে পরাশর

সংহিতা বিশেষভাবে প্রযোজ্য সে কথাও তিনি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করলেন।

বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্ত প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ছাপা হয় এবং পরে (জানুয়ারী ১৮৫৫) একটি ছোট পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তিকা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর গভীর জ্ঞানের নিদর্শন বহন করছে। তাঁর যুক্তিগুলিও ছিল অকাট্য।

বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিকাটি গোঁড়া সমাজকে দারুণ আঘাত করেছিল। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের নামে রক্ষণশীল সমাজের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই পুস্তিকাটি খোলাখুলিভাবে সংগ্রামের আহ্বান বলে তাঁরা মনে করলেন। রক্ষণশীল সমাজ বিপরীত যুক্তি দেখিয়ে পুস্তিকাটির তীব্র প্রত্যুত্তর দিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু সমাজের নেতা, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর বাড়ীতে দুটি বিতর্ক সভার আয়োজন করলেন। সেখানে বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য পণ্ডিতের মধ্যে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রগত বিধান সম্পর্কে বিতর্ক হল। সেই বিতর্কে বিদ্যাসাগর অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রবল যুক্তি স্থাপন করলেন। এমন কি রাজা রাধাকান্তও প্রভাবিত না হয়ে পারলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গেলেন। তবে এই মহৎ কার্য্যে বিদ্যাসাগর বেশীর ভাগ সাহায্য পেলেন ব্রাহ্ম নেতা ও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের কাছ থেকে। ধর্ম্মসভা নামে একটি দলের নেতৃত্বে রক্ষণশীলেরা নানা বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটি তখনকার সমাজে যে তুমুল

আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজ এই এতদিন পরে ধারণা করা কঠিন। সে যেন এক উত্তাল উৎক্ষেপ। রক্ষণশীল দলেরা বিদ্যাসাগরের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। তারস্বরে তাঁরা ঘোষণা করতে লাগলেন যে, বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা নষ্ট করছেন। বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ তা প্রমাণ করে অসংখ্য পুস্তিকা লেখা হতে লাগল। এমন কি টাকা দিয়ে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্বান লোকেদের মত সংগ্রহ করা হতে লাগল। বিদ্যাসাগরকে অজস্র গালি দেওয়া হল, তাঁকে নিয়ে বিদ্রুপাত্মক রচনা লেখা হল।

এই তথাকথিত বিদ্বান লোকেদের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার উপরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নির্ভর করত। কিন্তু বিদ্যাসাগর জানতেন যে শাস্ত্রের বিধান সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। তাঁরা বরং যুক্তিহীন সামাজিক প্রথাকে অন্ধের মত আঁকড়ে থাকতে চাইতেন।

বিদ্যাসাগর স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, এই যুক্তিহীন অন্ধ সামাজিক প্রথা ধর্ম্মের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এই প্রথাই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মকে মুছে দিয়েছে। ধর্ম্মের উপর সামাজিক প্রথার অত্যাচার দেখে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সমাজের প্রভাবশালীরা নারীদের উপর যে অত্যাচার করছিলেন বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লাগলেন। ধর্ম্মের নামে নারী নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের এই সংগ্রাম ছিল মুক্তির সংগ্রাম।

সাত দিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পুস্তকার দু'হাজার সংখ্যা বিক্রী হয়ে গেল। আরও তিন হাজার সংখ্যা ছাপাতে দেওয়া হল। শেষে আরও দশ হাজার পুস্তিকা ছাপাতে

হয়েছিল। ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাই যে শুধু এই বইয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই নয় দূর দূরান্তরের গ্রামবাসীরাও। সকলের মুখে মুখে তখন বিদ্যাসাগরের নাম। বিধবা বিবাহ ও বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লোকসঙ্গীত লেখা হল। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা লেখা হল। তাঁতিরা আবার সে কবিতা মেয়েদের শাড়ীর পাড়ে বুনে দিল।

প্রবল বাধা ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর আর একটি পুস্তিকা (১৮৫৫ অক্টোবর) প্রকাশ করলেন। এই পুস্তিকাতেও তিনি আগের মতই অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখালেন। বিরোধী পক্ষের কূট-তর্কের জাল সুন্দর ও শক্তিশালী ভাষায় ছিন্ন করলেন। তিনি গালির বদলে গালি দিলেন না; অকাট্য যুক্তি দিয়ে বিরোধী পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করলেন। বিদ্যাসাগরের আগে একমাত্র রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে এ রকম পাণ্ডিত্য দেখিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর দেশাচার বা সামাজিক প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "দেশাচার শাস্ত্রের মাথার উপরে পা রেখেছে, ধর্ম্মের মর্ম্মস্থলকে বিদ্ধ করেছে, ভাল ও মন্দের বিবেচনা শক্তি নষ্ট করেছে, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বিচারের পথ রুদ্ধ করেছে।" এই পুস্তিকায় আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "হে ভারতবাসী! তোমরা আর কতদিন বিভ্রান্তির শয্যায় শুয়ে মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকবে! তোমরা অনুভূতির চক্ষু খুলে দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার ও ভ্রূণ হত্যার পাপে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছে···দেশাচারের প্রতি দীর্ঘদিনের আনুগত্যের ফলে

তোমাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব এতদূর বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়েছে যে তোমাদের কঠিন ও সহানুভূতিহীন অন্তরে হতভাগিণী বিধবাদের দুর্দ্দশার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব করার শক্তি নেই, অথবা অজস্র ব্যাভিচার ও ভ্রূণহত্যার প্রতি ঘৃণা করার ক্ষমতাও তোমরা হারিয়েছ। তোমাদের প্রাণপ্রিয় কন্যাকে বৈধব্যের দুঃখদাহনে জ্বালাতে তোমরা প্রস্তুত। তোমাদের কন্যা অদম্য দৈহিক কামনার জন্য ব্যাভিচারে লিপ্ত হলেও তোমরা ধর্ম্ম ও নীতির মর্য্যাদাহানি উপেক্ষা করে তা সমর্থন করতে প্রস্তুত। কেবলমাত্র সামাজিক নিন্দার ভয়ে তোমরা তাকে ভ্রূণহত্যার কাজে সমর্থন করতে প্রস্তুত হও এবং এইভাবে পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হও, তবু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তোমরা পুনর্বার তাকে বিবাহ দিয়ে বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে প্রস্তুত নও। ···তোমরা মনে কর যে, স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের দেহ পাষাণের মত হয়ে যায়, সে আর দুঃখ ব্যথা অনুভব করে না, এবং তার অদম্য দৈহিক কামনা সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের এই সব অনুমান যে ভুল তা প্রতি পদে প্রমাণিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে···হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষজাতির অন্তরে দয়া নেই, যেখানে ধর্ম্ম নেই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই, হিতাহিত বোধ নেই, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে বিভেদ জ্ঞান নেই, কেবল লৌকিক প্রথা অনুসরণ করাই যেখানে পরম ধর্ম মনে করা হয়, সে দেশে যেন হতভাগ্য অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।”

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকা দুটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন ‘ম্যারেজ অব হিন্দু উইডোজ’ নাম দিয়ে।

বিদ্যাসাগরের উপর নিন্দা, গালি ও অপমান সমানভাবে

বর্ষিত হতে থাকলো। পথে চলবার সময় কখনও কখনও শত্রুভাবাপন্ন লোকজন তাঁকে অকস্মাৎ ঘিরে ধরে গালি বর্ষণ করতো।

এমন কি শারীরিকভাবে তাঁকে নির্য্যাতন করবার পরিকল্পনাও হয়েছিল। ভীত হয়ে তাঁর পিতা গ্রাম থেকে একজন বিশ্বস্ত লোককে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের দেহরক্ষী হিসাবে। বিদ্যাসাগর এটা বিশেষ পছন্দ করেন নি। মৌখিক গালি বা শারীরিক নির্য্যাতনের ভয়ে দমে যাওয়ার মত লোক ছিলেন না তিনি। বৃষ রাশিতে জন্ম হয়েছিল বলে তিনি বরাবর এঁড়ে বাছুরের মত জেদী ছিলেন। জেদ বস্তুটাকে সব সময় প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বেলায় এই জেদ খুবই গৌরবের বস্তু হয়ে উঠেছিল। প্রবল বিরুদ্ধতা সত্বেও তিনি তাঁর কাজে অটল রইলেন।

বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটিতে জোরালো যুক্তি তর্ক ছিল এবং বইটি সমাজে পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছিল। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার কথা চিন্তা করলেন। আইন করে বিধবা বিবাহ চালু করলে এ বিষয়ে আর বিরুদ্ধতার অবকাশ থাকবে না। সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর নিয়ে বিদ্যাসাগর ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে একটি আবেদনপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। এই আবেদনপত্রে তিনি "হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইনগত অসুবিধা দূর করে এই বিবাহের সন্তানদের বৈধ বলে ঘোষণা" করে একটি আইন তৈরী করার অনুরোধ করলেন।

১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর জে. পি. গ্রান্ট নামে একজন সদস্য সভায় এই মর্ম্মে একটি বিল উত্থাপন করলেন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তিনি "সংস্কৃত কলেজের বিদ্বান ও বিশিষ্ট অধ্যক্ষ" ও "যে আন্দোলনের ফলে এই বিল উত্থাপন করা হয়েছে তার প্রধান উদ্যোক্তা" বলে উল্লেখ করলেন। গ্রান্ট এই যুক্তি দিলেন যে, এই বিলের দ্বারা ধর্ম্মের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না কারণ এটা অনুমতিসূচক আইন এবং "যাদের উপকারের জন্য এই আইন তৈরী হবে তারা যখন এই আইনের আশ্রয় চাইবে কেবলমাত্র তখনই এই আইন তাদের পক্ষে প্রযোজ্য হবে।" স্যার জেম্‌স কোলভিল নামে অপর একজন সদস্য এই বিলটি অনুমোদন করবার সময়ে বিদ্যাসাগরের "উদার মত" এবং "সমাজ সংস্কারের প্রবল আগ্রহের" ভূয়সী প্রশংসা করেন।

"যে স্বামীকে হয়ত কেবলমাত্র বিবাহের মন্ত্র পড়ার সময় দেখেছে সেই স্বামীর মৃত্যুর পর তার প্রতি কর্ত্তব্য ও শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য কুমারী বাল-বিধবাদের সারাজীবন ধরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয় দমন করে চলবার ভয়ঙ্কর বিধানের" তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থ সংরক্ষণাগারের (ন্যাশনাল আর্কাইভস্) ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কার্য্য বিবরণীর মধ্যে রক্ষিত বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, এই বিল উত্থাপনের ফলে সারা দেশে কি রকম তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। বিলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অসংখ্য ব্যক্তির স্বাক্ষর করা বহু আবেদনপত্র কাউন্সিলের কাছে এসেছিল, তারমধ্যে বেশীর ভাগই ছিল বিপক্ষে। কেবলমাত্র বাংলাদেশ থেকেই

আবেদনপত্র এসেছিল তাই নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা থেকে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত থেকেও। গ্রান্ট হিসাব করে বলেছিলেন যে "পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে চল্লিশের বেশী আবেদনপত্র বিলের বিপক্ষে এবং পাঁচ হাজারের কিছু বেশী লোকের স্বাক্ষর নিয়ে পঁচিশটির বেশী আবেদনপত্র বিলের পক্ষে কাউন্সিলের কাছে পাঠানো হয়েছিল।" সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই যে সর্ব্বদা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় তা নয়। সাধারণতঃ অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিই সংস্কারের কাজে অগ্রণী হন।

নথিপত্র থেকে একটা অভিনব কথা জানা যায়। কলকাতার ৪৪ জন এদেশীয় নাগরিক বিধবা বিবাহকে রেজিষ্ট্রি করার জন্য একটি অনুচ্ছেদ ঐ বিলের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব কাউন্সিলের কাছে করেছিলেন। কিন্তু তা করা হয় নি। সিলেক্ট কমিটি যে ভাবে বিলটির খসড়া করেছিলেন সেই ভাবে সেটা অনুমোদিত হয়ে গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি নিয়ে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিলটি পাশ হয়েছিল। ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে সে হ'ল এক স্মরণীয় দিন।

বিলটিতে যে বিবাহ রেজিষ্ট্রি করার অনুচ্ছেদ যুক্ত হল না তা বিদ্যাসাগরের ভুল বা ত্রুটির জন্য নয়। বোধহয় তিনি মনে করেছিলেন বিবাহ রেজিষ্ট্রি করার প্রস্তাবটি সে যুগের পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি না থাকার জন্য কয়েকটি বিবাহ সফল হল না দেখে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছিল যে বিবাহের সময় দু'পক্ষ একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলে ভাল হয়।

এরপর সুরু হল আইন চালু করার কাজ। কিছুদিন পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহ দেওয়ার জন্য কেউই সাহস করে এগিয়ে এল না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও উৎসাহের পুরস্কার মিলল। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার বাড়ীতে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং পাত্রী বার বৎসর বয়স্কা বিধবা কালীমতি এই বিবাহ সারা সহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। গোলযোগ ঘটতে পারে আশঙ্কা করে বিদ্যাসাগর আগে থেকেই পুলিসের ব্যবস্থা করেছিলেন। যে বাড়ীতে বিবাহ সম্পন্ন হল সে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বিরাট জনতার সমাবেশ হয়েছিল। এই অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয় ঘটনা কেমন করে সম্ভব হচ্ছে তা দেখতে বেশীর ভাগ লোক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এসেছিল এ ব্যাপারকে তাচ্ছিল্য করার জন্য, আবার কেউ কেউ মজা দেখতে। কিন্তু প্রগতিশীল দলের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিরা এই প্রয়াসকে সফল করার জন্য সর্ব্বান্তকরণে সাহায্য করেন। বিখ্যাত সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। তিনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন এবং প্রথম থেকেই বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই বিধবা বিবাহে উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তিনি যোগ দেন নি। পশ্চাৎ অপসারণের এইটাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়, আরও অনেকে এই রকম করে-ছিলেন। কিন্তু রমাপ্রসাদের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর সবচেয়ে বেশী আঘাত পান। রমাপ্রসাদ যে সে ব্যক্তি নন, তিনি মহান

সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহনের পুত্র। বিদ্যাসাগরের আদর্শ ছিল রামমোহন রায়। গল্প আছে যে বিবাহের আগে বিদ্যাসাগর রমাপ্রসাদের কাছে গিয়ে তাকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রমাপ্রসাদ বলেছিলেন তিনি অন্তরাল থেকে এই কাজে সহযোগিতা করবেন কিন্তু প্রকাশ্য-ভাবে এই বিবাহে যোগদান করবেন না। এই কথায় বিদ্যাসাগর এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে রমাপ্রসাদের দেওয়ালে টাঙানো রামমোহনের ছবির দিকে আঙুল তুলে স্বক্ষোভে বলেছিলেন, "ছবিটা খুলে ফেলুন, বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিন।" বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে তিরস্কার ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয় তার পরের দিন। পাত্র পাত্রী ছিলেন মধুসূদন ঘোষ ও থাকমণি।

বিদ্যাসাগর নিজের দায়ীত্বে অনেকগুলি বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র বিবাহ দিয়েই তিনি তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করতেন না। নববিবাহিত দম্পতির মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বরকম সাহায্য করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতেন। বিধবা বিবাহের খরচ প্রচুর ছিল। যৌতুক, গহনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ও নানাবিধ ব্যবস্থা করতে হত। এ সবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এর সমস্ত ব্যয় বিদ্যাসাগর নিজেই বহন করতেন। তা না করলে কেউই বিধবা বিবাহ করতে রাজী হতেন না। অতএব বিদ্যাসাগর প্রচুর খরচ করে জাঁকজমকের সঙ্গে বিধবা বিবাহ দিতেন। তিনি এ জন্য বেপরোয়াভাবে ব্যয় করে খুব ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এক একটি বিবাহে তিনি দশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়

এই যে, যারা প্রথমে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন, ও সর্ব্বরকমে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পিছিয়ে যান। আর্থিক দায়ীত্বের গুরুতর বোঝা বিদ্যাসাগরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা সরে পড়লেন। বিদ্যাসাগর একাই এ সংগ্রাম করে চললেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বাবা দুর্গাচরণ ব্যানার্জীকে বিদ্যাসাগর একটি পত্রে জানান যে তিনি দুর্গাচরণের কাছ থেকে যে অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন তা শোধ করতে না পারার জন্য দুঃখিত। শোধ করতে না পারার কারণ এই যে যারা বিদ্যাসাগরকে অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা তাঁকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই ক্রমঃবর্দ্ধমান ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ও তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়েও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। তিনি গ্রামাঞ্চলেও বিধবা বিবাহ প্রচলন করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচরণ বিদ্যারত্নের বই থেকে জানা যায় তাঁদের অসাধারণ গুণবতী মা বিদ্যাসাগরকে এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিলেন। কখনও কখনও বিধবা বিবাহের পর নব দম্পতিকে বিদ্যাসাগরের গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হ'ত।

বিদ্যাসাগরে একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র পরে একটি বিধবাকে বিবাহ করেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা একঘরে করার ভয় দেখালে বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখেন, "আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কাজ এই বিধবা বিবাহ প্রচলন। এর চেয়ে মহত্তর কোনও কাজ করার সম্ভাবনা এ জীবনে আর নেই। এই কাজের জন্য আমার সর্ব্বস্ব

গেছে এবং প্রয়োজন হলে এর জন্য আমার জীবন পণ করতেও দ্বিধাবোধ করব না। এই অবস্থায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ তো অতি সামান্য আত্মত্যাগ। আমি কখনই সামাজিক প্রথার দাস নই। আমার নিজের জন্য বা সমাজের জন্য যা আমি ভাল বলে মনে করব তা আমি অবশ্যই করব এবং লোকের বা আত্মীয়স্বজনের সমালোচনার ভয়ে আমি নিবৃত্ত হব না।"

বিধবা বিবাহ প্রথম দিকে বেশ প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উৎসাহ কমে আসতে লাগল। কেবল মাঝে মাঝে দু'একটি বিবাহ হতে থাকল। প্রথম দিকের উৎসাহী লোকেরা পিছিয়ে গেলেন। অনেক সুবিধাবাদী লোকেরা হঠাৎ কিছু অর্থ পেয়ে যাওয়ার আশায় বিধবা বিবাহ করতে এগিয়ে এল, শেষে তারাও প্রতারণা করল। এই প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলার ক্ষমতা তখনকার সমাজের ছিল না। বিদ্যাসাগরের মন ভেঙ্গে গেল, কিন্তু তবু তিনি কখনও তাঁর আদর্শে বিশ্বাস হারান নি।

সে যুগের পক্ষে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার খুবই বৈপ্লবিক। কিন্তু প্রায় সব সংস্কারের বেলাতেই অল্প বিস্তর এই রকমই হয়ে থাকে। প্রথমে কোনও একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কারের জন্য প্রয়াসী হন। সাধারণ লোকেদের মানসিক প্রস্তুতির আগেই সংস্কারের কাজ সুরু হয়। ক্রমে সংস্কারের কাজের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। আগেকার প্রগতি বিমুখ সমাজে নারীকে হীন বলে মনে করা হ'ত। এখন

বিধবা বিবাহের চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারা এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছেন।

সমাজের এখন যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন আজ থেকে একশত বছর আগে একজন সরল, সাহসী সংস্কারক। তিনি তাঁর যুগের লোকেদের তুলনায় অনেক দূরদর্শী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক মানুষদের চেয়ে অনেক উন্নত স্তরের মানুষ ছিলেন।

বহু বিবাহের বিরুদ্ধতা

বাধ্যতামূলক বৈধব্যদশা নিবারণ করাই যে বিদ্যাসাগরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাই নয়। এই সঙ্গে জড়িত আর একটি কুপ্রথা বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। তখনকার দিনে এক একজন লোক অনেকগুলি বিবাহ করতেন এবং তার মৃত্যু হলে একই সঙ্গে অনেকে বিধবা হতেন। এই ভাবে বহু বিবাহের কুপ্রথার জন্য বিধবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। এই ঘৃণ্য প্রথা যে সমাজের কত বড় ক্ষতি করছিল, তা বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি এই প্রথা তুলে দেবার জন্য প্রয়াসী হন। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিধবা বিবাহ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। সেই সময় তিনি আড়াই হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠান। আইন করে বহু-বিবাহ বন্ধ করার জন্য এই আবেদনপত্রে সমাজের কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিও স্বাক্ষর করেছিলেন।

কুলীন প্রথা ও বহু বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুর বিধান অনুসারে অনুপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া কখনও উচিত নয়, এমন কি যদি সে কন্যাকে চিরজীবন অবিবাহিত থাকতে হয় তবুও নয়। এই সাধারণ নিয়মকে এমন বিকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হ'ত যে উচ্চবর্ণের উপযুক্ত পাত্র না পেলে পিতামাতারা যে কোনও কুলীনের হস্তে কন্যাদান করতেন। এমন কি, সে কুলীন ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ হতেন কিম্বা তার কয়েক ডজন স্ত্রী থাকত তবুও তার

সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে দ্বিধা করতেন না। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা কন্যার মঙ্গলের চেয়ে কোনও মতে বিবাহ নামক রীতি রক্ষা করাটাই জরুরী কাজ বলে মনে করতেন। সামাজিক প্রথার জন্য নিরপরাধ মেয়েদের নিষ্ঠুরভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া হ'ত।

বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথা রদ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন পাঠালেন। সামাজিক প্রথার কঠিন দুর্গে তিনি আর একবার আঘাত করলেন। স্থির হল জে. পি. গ্রাণ্ট এই মর্ম্মে একটি বিল আনবেন। কিন্তু সে সময় লোকে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেই বেশী আগ্রহশীল ছিল এবং সমস্ত মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। তারপর সমাজ সংস্কারের সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে। অনেকে এমন অনুমানও করলেন যে এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন। কিছুদিন পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খলা চলল। তারপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পরে ভারত ও ভারতবাসীদের প্রতি তাদের মনোভাব বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। মহারাণীর ঘোষণায় এই আশ্বাস দেওয়া হল যে "অতঃপর সরকার ভারতীয় প্রজাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও পূজা অর্চ্চনার ব্যাপারে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবেন না।" মনে হয় ভারতীয়দের সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে প্রথমদিকে ব্রিটিশের যে উৎসাহ ছিল, এই কারণে তার অবসান হ'ল।

বিদ্যাসাগর পরাজয় স্বীকার করার লোক ছিলেন না। সিপাহী বিদ্রোহের অশান্তি ও অব্যবস্থা কেটে যাওয়ার পর

তিনি আবার অক্লান্তভাবে চেষ্টা সুরু করলেন। ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আর একটি আবেদনপত্র গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠালেন বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন তৈরী করার জন্য। এই আবেদনপত্রে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা সহ একুশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। এই একই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে বাংলাদেশের তখনকার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই ভাবে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন নূতন করে শক্তিলাভ করল।

কিন্তু এবার গভর্ণমেণ্ট আগের চেয়ে একটু বেশী সতর্ক। এ বিষয়ের সব দিক নিয়ে বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হল। এই কমিটি স্বীকার করলেন যে, এই প্রথা সমাজের অনেক ক্ষতি করছে। কিন্তু তাঁরা এর বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাবও করলেন না। মনে হয় গভর্ণমেণ্ট ভেবে দেখলেন দেশের, এমন কি বাংলা-দেশের একটি বড় অং• এই প্রথা বন্ধ করার বিরুদ্ধে। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষিত সংখ্যালঘুদের অভিমত মেনে নিয়ে আইন করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আর তা করলেন না। বহু বিবাহ বন্ধ না করে শুধু বিধবা বিবাহ চালু করার আইন প্রণয়নের অর্থ অসমাপ্ত সমাজ সংস্কার ব্যবস্থা। যতদিন পর্য্যন্ত এক বিবাহ প্রথাকে সমাজ একমাত্র উচিত পথ বলে মেনে নিয়েছে ততদিন এই বহু বিবাহ প্রথা চালু রইল।

বিদ্যাসাগরের মত আদর্শবাদী এত সহজে ভেঙ্গে পড়ার পাত্র নন। তাঁর সংগ্রামশীল মন পরাজয় স্বীকার করল না।

গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে আইন করাতে না পেরে তিনি অন্য পন্থা গ্রহণ করলেন। তিনি খোলাখুলিভাবে বহু বিবাহের নিন্দা করতে সুরু করলেন। শক্তিশালী লেখনী দিয়ে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য যেমন সংগ্রাম করেছিলেন এবারও তিনি সেই অস্ত্র দিয়ে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। শাস্ত্র ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসে ও ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বহু বিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে দুটি অমূল্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সে সময় তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল এবং তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। এই দুটি পুস্তিকার মধ্যে তিনি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দেন। শাস্ত্রের বিভিন্ন নির্দ্দেশ ব্যাখ্যা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে বহু বিবাহ প্রথা যে ভাবে চালু আছে তার পিছনে কোনও শাস্ত্রীয় অনুমোদন বা বাধ্যবাধকতা নেই। বিদ্যাসাগর সমাজের নানাবিধ কুপ্রথা, যৌতুক, বালবিবাহ বিশেষ করে বহু বিবাহকে আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল সভ্য ও মার্জ্জিত।

কৌলিন্য ও বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তি ছিল অকাট্য। বস্তুতঃপক্ষে বহু কুলীন তাদের জাতিগত গৌরব হারিয়েছিলেন। কৌলিন্য প্রথার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে তিনি দেখালেন অর্থলোলুপতার জন্য এই প্রথা কতদূর হীন হয়ে উঠেছে এবং এর নিন্দনীয় অপব্যবহার কি ভাবে সমাজকে দুর্ব্বল করে তুলছে। সমাজে নারীজাতির স্থান হীন প্রতিপন্ন করার ফলে তাদের কত দুঃখকষ্ট ও দুর্দ্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হয় সে বিষয়ে তিনি তাঁর অন্তরের গভীর দুঃখ

প্রকাশ করেছেন। বহু বিবাহ সম্বন্ধে লিখিত তাঁর প্রথম পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ; "স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের তুলনায় দুর্ব্বল, আবার সামাজিক প্রথার দৌরাত্ম্যে তাদের পুরুষদের অধীন করে রাখা হয়েছে। এই দুর্ব্বলতা ও পুরুষের আধিপত্যের ফলে স্ত্রীলোকদের পরাধীন ও মর্যাদাহীন জীবনযাপন করতে হয়। প্রভুত্বকারী পুরুষ তাদের সন্ত্রস্ত করে রাখে, অন্যায়ভাবে তাদের সঙ্গে যেমন ইচ্ছা তেমন আচরণ করে। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে।" এই ছিল বিদ্যাসাগরের যথার্থ পরিচয়। এ আজ একশত বছর আগের কথা।

এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগর একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। তিনি হুগলী জেলার ১৩৩ জন ব্রাহ্মণের বিবাহের একটি তালিকা তৈরী করে দেখান যে জাতি শ্রেষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে কৌলিন্য প্রথার অপব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ নীচে দেওয়া হল,—

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৫৫, স্ত্রী সংখ্যা ৮০ ; ভগবান চট্টোপাধ্যায়, বয়স ৬৪, স্ত্রী সংখ্যা ৭১ ; পূর্ণ মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫৫, স্ত্রী সংখ্যা ৬২ ; মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, বয়স ৪০, স্ত্রী সংখ্যা ৫৬, দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ১০ বছরের তরুণের স্ত্রীর সংখ্যা ১৬।

বিদ্যাসাগর বহু বিবাহের বিরুদ্ধে এভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাধ্যতামূলক বৈধব্য দশার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যে স্বভাবগত তেজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন এখন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বয়সে ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে আর সে রকম কাজ করতে পারছিলেন না। এই বহু বিবাহ নিরোধক

আন্দোলনের ফলে তাঁকে যথারীতি গালি ও অপবাদ কুড়োতে হচ্ছিল। তবুও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। এই দুই শক্তি সে সময় সমাজে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের বিষয়ে আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন: অল্পবয়সী বধূদের রক্ষার জন্য সহবাস সম্মতি বিল সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। তখন ১৮৯০ সাল, বিদ্যাসাগর অসুস্থ ও মৃত্যুশয্যায়। গভর্ণমেণ্ট এই বিল সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মত জিজ্ঞাসা করেন। এই বিলটি প্রধানতঃ পার্শী সমাজ সংস্কারক মালাবারীর উদ্যোগে উত্থাপিত হয়। এই বিলের উদ্দেশ্যে ছিল বাল্য বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করা এবং বালিকা বধূর বয়স বার বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত সহবাস দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারটি রদ করা। বিদ্যাসাগর বললেন হিন্দুদের পক্ষে গর্ভাধান অনুষ্ঠান যখন আবশ্যিক ক্রিয়া এবং কবে বালিকা বধূ প্রথম রজঃস্বলা হবে জানা নেই, তখন সহবাস সম্মতির বয়স ইচ্ছামত বার বৎসর নির্দিষ্ট করার তিনি বিরোধী। তিনি প্রস্তাব করলেন যে বিলটি এমনভাবে তৈরী করা হোক যাতে কোনও স্বামী যদি তার স্ত্রী প্রথম রজঃস্বলা হওয়ার আগে বিবাহ সম্পূর্ণ করে তবে তা' আইনতঃ অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। বিদ্যাসাগরের মতে এই ভাবে কাজ করলে বিলে উল্লিখিত প্রস্তাবের চেয়ে "আরও ব্যাপকভাবে বালিকা বধূদের কল্যাণ করা সম্ভব হবে।" বাল্য বিবাহ প্রথায় এই নির্য্যাতিত অসহায় বলিকা বধূদের জন্য তাঁর অসীম সহানুভূতি ছিল। তিনি এই রকম বিবাহ নিবারণ

করার জন্য কেবলমাত্র শাস্ত্রের নজীর দেখিয়ে ক্ষান্ত হন নি। গভর্ণমেন্টকে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে "স্ত্রীর প্রথম রজঃদর্শনের আগে যদি কোনও ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তবে সেটা দণ্ডযোগ্য অপরাধ হবে," এই মর্ম্মে যেন অবশ্যই একটা আইন করা হয়। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে শেষবারের মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি শেষবারের মত দেশের আইন প্রণেতাদের কাছে নিপীড়িত নারীজাতির পক্ষ হয়ে গভীর আবেদন জানালেন।

লোকমান্য তিলক এই বিলের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতের কথা এখানে উল্লেখ করা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিদ্যাসাগরের মত তিনিও অনুভব করতেন যে সহবাস সম্মতির জন্য ইচ্ছামত একটা বয়স ধার্য্য করা ঠিক হবে না, বরং তারজন্য প্রথম রজঃস্বলা হওয়ার বয়সকে উপযুক্ত সময় বলে নির্দিষ্ট করা উচিত। বাল্য বিবাহ সমাজের অনেক ক্ষতি করছে একথা অস্বীকার না করলেও তিলক এই বিলের বিরোধিতা করেন। তাঁর বিরুদ্ধতার প্রধান কারণ এই যে, এই বিলটির দ্বারা হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্ম্মীয় স্বাধীনতার উপর বিদেশী হস্তক্ষেপ করা হবে।

সমাজ সংস্কারের অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে আর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সুরাপানের অভ্যাস সমাজের মধ্যে বহুলাংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগর মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনে আর একজন সমাজ সংস্কারক শ্রীপ্যারীচরণ সরকারের সঙ্গে অন্তরিকভাবে সহযোগিতা

করেন। প্যারীচরণ সরকার 'বেঙ্গল টেমপারেন্স সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

সমাজ সংস্কার বিদ্যাসাগরের প্রাণ বায়ুর মত ছিল। তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য দশটি প্রস্তাব বিশিষ্ট এক অঙ্গীকারপত্র রচনা করেন। এ থেকে বোঝা যায়, সমাজের সমস্ত কুপ্রথা দূর করার জন্য তাঁর অন্তর কতটা ব্যাকুল হয়েছিল। যারা সেই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতেন ধর্ম্মের নামে তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হত যে, তারা তাদের কন্যাদের শিক্ষা দেবেন, ১১ বছর বয়সের পূর্ব্বে মেয়েদের বিবাহ দেবেন না, কৌলিন্য প্রথার কথা চিন্তা না করে স্বজাতির সৎপাত্রে কন্যাদান করবেন, বিধবা কন্যাদের সম্মতিক্রমে তাদের পুনর্বিবাহ দেবেন, পুত্রদের ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেবেন না, এক স্ত্রী জীবিত থাকতে নিজেরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করবেন না, যার এক স্ত্রী জীবিত আছে এমন পাত্রে কন্যাদান করবেন না, শপথ পালনে ব্যাঘাত ঘটে এমন কোনও কাজ করবেন না, নির্দিষ্ট কোষাধ্যক্ষের কাছে মাসিক আয়ের এক পঞ্চমাংশ দান করবেন এবং একবার অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করার পর তা পালনে পশ্চাৎপদ হবেন না। তিনি মাত্র ১২৫ জন স্বাক্ষরকারী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে

এবার আমরা বিদ্যাসাগরের সরকারী কর্ম্মজীবনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। তাঁর জীবনের এ অধ্যায়কে খুব সুখের বলা যায় না। মনে রাখা দরকার ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে সেক্রেটারীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ার ফলে তিনি গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে দেন। অর্থাৎ সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে তিনি পরাজিত হন। তারপরে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আবার সেখান প্রবেশ করার পর ব্যালেনটাইন রিপোর্টের ব্যাপারে অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হন। সেবারে গভর্ণমেণ্ট তাঁর মত সমর্থন করেন। কিন্তু স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে যে অপ্রস্তুত করেন তাতে তিনি গভীর আঘাত পান। তাছাড়া তরুণ সিভিলিয়ান, জনশিক্ষা অধিকর্ত্তা গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বহু ব্যাপারেই তাঁর মতান্তর ঘটতে থাকে। ডাঃ মউয়াট, হ্যালিডে, সিসিল বিডনএর মত উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং সাধারণত তাঁর অভিমত সমর্থন করতেন। হ্যালিডের সঙ্গে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল। কারণ এ বন্ধুত্ব ছিল একজন ইংরাজের সঙ্গে একজন ভারতীয়ের, একজন উপরওয়ালার সঙ্গে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর বন্ধুত্ব। এইসব শুভানুধ্যায়ী বিদেশীয়দের সহায়তা ও উৎসাহের জন্য বিদ্যাসাগর তার শিক্ষা সংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু আগেকার 'কাউন্সিল অব্ এডুকেশানে'র পরিবর্ত্তে শিক্ষা বিভাগের সমস্ত দায়িত্বভার যখন একজন তরুণ কর্ম্মচারীর উপর দেওয়া হ'ল তখন থেকে বিদ্যাসাগরের

স্বাধীনসত্তা নানা বাধার সম্মুখীন হতে লাগল। নিজের কাজের পক্ষে অনুকূল পরিবেশের অভাবই বিদ্যাসাগরকে পীড়িত ক'রে তুললো।

তাঁর জীবনের মহান ব্রত পালনের উপযুক্ত পরিবেশ তো ছিলই না, উপরন্তু বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়তে লাগল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি দীর্ঘ ছুটি নিতে পারতেন, একেবারে পদত্যাগ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর একটি ঘটনায় বিদ্যাসাগর খুব হতাশ হয়ে পড়েন। মিঃ লজ নামে একজন ইংরাজকে দক্ষিণ বাংলার স্কুলগুলির পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। এটা সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব। কারণ ঐ পদ খালি হলে শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য বিদ্যাসাগরেরই ঐ পদ পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে দাবী অগ্রাহ্য করা হল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে, বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের দাবী সমর্থন না করাই স্থির করলেন। অনুমান কোনও মহল থেকে তার উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল, অথবা এর পেছনে ছিল ভারতীয়দের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব। যাই হোক, এই ঘটনায় বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে সুবিচার পাওয়ার মোহ বিদ্যাসাগরের ভেঙ্গে গেল। অতএব ১৭৫৭ সালের আগষ্ট মাসে পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জনশিক্ষা অধিকর্ত্তাকে তিনি একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রের একটা প্রতিলিপি হ্যালিডের কাছেও পাঠিয়ে দেন। হ্যালিডে এজন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কিছুটা বিস্মিত হন এবং পদত্যাগ না করার জন্য বিদ্যাসাগরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

হ্যালিডের সম্মানে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে বিদ্যাসাগর আর এক বছর কাজ করতে রাজী হন। অবশেষে ১৮৫৮ সালের আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। ১৮৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট তাঁর পদত্যাগপত্র দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করে মন্তব্য করেন যে, পণ্ডিত কিছুটা "অশোভন ভাবে" পদত্যাগ করেছেন, কারণ "তাঁর অসন্তোষের কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না।" কিন্তু গভর্ণমেণ্ট "ভারতবাসীর শিক্ষার কাজে তাঁর দীর্ঘ ও উৎসাহপূর্ণ কাজের" কথা স্বীকার করেন। এই সামান্য স্বীকৃতি শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ প্রাণপণ কর্মসাধনারই পুরস্কার। তিনি অন্য কোনও পুরস্কার পান নি, এমন কি কোনও পেনসনও পান নি। কারণ তাঁর কর্ম্মকাল ছিল দশ বছরের সামান্য কিছু বেশী।

এই পদত্যাগের সময় বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মধ্যে খুব বেশী করে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য তখন পুস্তক প্রকাশের কাজ থেকে তাঁর অর্থাগম বেশ ভালই হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর দানের পরিমাণও নেহাৎ কম ছিল না। বাকল্যাণ্ডের মতে তখন দানের জন্য মাসে প্রায় দেড় হাজার টাকা বিদ্যাসাগরের ব্যয় হত। এ ছাড়া বিধবা বিবাহের জন্যও তাঁর অসম্ভব রকম খরচ হত। তবুও তিনি পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে দিলেন। অধ্যক্ষ হিসাবে মাসিক তিনশো এবং বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক রূপে মাসিক দু'শো টাকা তখন তিনি পাচ্ছিলেন। যে ব্যক্তি এমন চাকরী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে পারেন তাঁর কী অসীম আত্মপ্রত্যয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সরকারী কর্ম্মচারীর বেশে বিদ্যাসাগর ছিলেন স্বার্থত্যাগী সংস্কারক। অতএব তিনি যখন দেখলেন যে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের অনুকূল পরিবেশ নেই এবং সরকারী চাকুরীর কঠিন আবেষ্ঠনীর বাইরে থেকেই তিনি সে ব্রত আরও ভালভাবে পালন করতে পারবেন, তখন সরকারী চাকরী ছেড়ে দেওয়া থেকে কেউই তাঁকে নিরস্ত করতে পারল না। অর্থের প্রয়োজনীয়তা তিনি অবশ্যই বুঝতেন এবং অর্থ চাইতেনও বটে, কিন্তু আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি নিজের জীবনের ব্রতকে ক্ষুন্ন করে নয়। 'ধুতি, চাদর ও চটি' পরিহিত এই সরল পণ্ডিত লাটভবনে মাথা উঁচু করে চলতেন। ইস্পাতের মত অনমনীয় মানুষ ছিলেন তিনি।

সমাজ সংস্কারের অসম্ভব খরচ এবং দানের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরের এত অর্থভাব হয়েছিল যে, একসময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদের জন্য প্রার্থী হয়ে তখনকার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার সিসিল বিডনকে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু সেই দুঃসময়েও তাঁর আত্মসম্মান বোধ এত তীব্র ছিল যে, তিনি পূর্ব্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোনও ইউরোপীয় অধ্যাপকের চেয়ে কম বেতনে তিনি চাকরী গ্রহণ করবেন না। মনে হয় বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও বিডন এই সর্ত্ত পূরণ করা খুব সহজ মনে করেন নি। সেখানেই এই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এইভাবে তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায় শেষ হ'ল। তাঁর চাকরী জীবনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তাঁকে তাঁর স্বাধীন স্বভাব, সাধুতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সম্মান করতেন। তিনি খুব স্বাধীনচেতা পুরুষ

ছিলেন এবং তাঁর কার্য্যসাধনের মহান উদ্দেশ্য সরকারী চাকরীর সঙ্কীর্ণ কাঠামোর মধ্যে থেকে পূরণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু যতদিন চাকরী করেছিলেন ততদিন তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন রূপ দিয়ে তার বুনিয়াদ শক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে সে শিক্ষা ভবিষ্যতে প্রসার লাভ করতে পারে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে লোকের মনে শিক্ষার রূপ, বিষয় ও মাধ্যম সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ ছিল। সবচেয়ে অসুবিধা ছিল এই যে, সে যুগে কোনও শিক্ষাব্রতী ছিলেন না ; সরকারী কর্ম্মচারীরাই শিক্ষার মত একটি গুরুতর বিষয় পরিচালনা করতেন। শিক্ষার কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশের ব্যাপারে ভারতীয়দের বিশেষ কোনও হাত ছিল না। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেও বিদ্যাসাগর তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

চাকরী ছেড়ে দিলেও তিনি সরকারী সংস্রব পরিত্যাগ করেন নি। গভর্ণমেণ্ট তাঁর কাছে শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে মতামত চাইতেন। যেমন, সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মত চাওয়া হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজ তুলে দিয়ে সেই টাকায় তখনকার অন্যান্য স্কুল কলেজে সংস্কৃত শিক্ষাদানের যে প্রস্তাব হয়েছিল তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। জন-শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধেও তাঁর মত চাওয়া হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ার কিছুদিন আগে গভর্ণমেণ্ট 'ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিট্যুশান' নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল রাজা ও জমিদারদের নাবালক উত্তরাধিকারীদের শিক্ষা দেওয়া। ১৮৬৩ সালে বিদ্যাসাগর এই

প্রতিষ্ঠানের ভিজিটর বা পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং সেই সুবাদে তিনি কতকগুলি সংস্কারের সুপারিশ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈহিক শাস্তি দেওয়া যে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ঘৃণা করতেন তা অন্যান্য ব্যাপারে জানা গিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য থেকেও তা জানা যায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট 'হিন্দু-উইলস্ বিল' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অভিমত জানতে চান। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় বিধান আছে সেই অনুসারে তিনি অভিমত দেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গভর্ণমেণ্ট তাঁর কাছে 'সহবাস সম্মতি বিল' সম্বন্ধেও মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সরকারী কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের একটি মহৎ কাজ করেন। তা হল 'হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা। এ কাজে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। যখন এই ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন জীবনবীমা ও পারিবারিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দু মধ্যবিত্তদের পক্ষে এই ব্যবস্থার বিশেষ অর্থ নৈতিক তাৎপর্য্য ছিল। এ্যানুইটি ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে, বিদ্যাসাগর স্বপ্নদর্শী আদর্শবাদী ছিলেন না, বরং কঠোর বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ও অর্থনীতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তখনকার দিনে সংসার ছিল একান্নবর্তী। বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন একান্নবর্ত্তী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তিনি জানতেন যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার পরিবারের লোকদের কত অসহায় অবস্থা হয়। টাকা পয়সার ব্যাপারে একজন বিধবাকে কত অসহায়ভাবে এবং কিরকম সামাজিক বিধি নিষেধের

মধ্যে জীবন কাটাতে হয় তাও তিনি জানতেন। অতএব তিনি যে পরিকল্পনা করলেন সেই অনুসারে প্রতিমাসে এক ব্যক্তি যদি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফাণ্ডে জমা দেয় তবে তার মৃত্যুর পর তার পরিবারবর্গ অবশ্যই কিছু ন্যূনতম সাহায্য পাবে।

বিদ্যাসাগরের অবসর জীবনের আর একটা বড় কাজ হল মেট্রোপলিটান ইনষ্টিট্যুশান। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল'। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের কম খরচে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতার কয়েকজন বাসিন্দা মিলে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনে সমস্ত শিক্ষা প্রচেষ্টার কাজে বিদ্যাসাগর কোনও না কোনও ভাবে সাহায্য করতেন। অতএব তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত হন। পরে পরিস্থিতি এমন হল যে তাঁকে সেই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ'ল। এর নূতন নাম হ'ল হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিট্যুশান। বৃদ্ধ বয়সে সমাজ সংস্কারকের অবসর জীবনে এই প্রতিষ্ঠান ছিল সবচেয়ে প্রিয় কর্ম্মস্থল। তিনি প্রায় মাতাপিতার স্নেহে এই প্রতিষ্ঠানটি লালন পালন করতেন। ১৮৬৪ সালে তিনি এখানে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আনার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হল না। কারণ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় কর্ম্মকর্ত্তারা মনে করতেন যে 'এক নেটিভের' দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সত্যকারের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। ১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর আবার এই বিদ্যালয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করতে চান। এবার এখান থেকে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা

দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে বিদ্যালয়টির উন্নতি হতে লাগল। ‚ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে লাগল। একজন নেটিভের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান পরীক্ষায় এত ভাল ফল করছে দেখে ইউরোপীয় শিক্ষাব্রতীরা ও মিশনারীরা বিস্মিত হলেন ও একটু হিংসার ভাবও জাগলো।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটুাশান সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। তাহলে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ও চিন্তাধারার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথমতঃ তিনি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তিনি ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে বর্জ্জন করতে চাননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখার দিন চলে গেছে। তাছাড়া দেশে তখন যে পুনর্জ্জাগরণ সুরু হয়েছিল তাকে শক্তিশালী করতে হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলি আছে তাদের মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটাবার প্রয়োজন ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজের ছাত্রেরা যাতে স্বল্প ব্যয়ে ইংরাজী শিক্ষা পেতে পারে সেজন্য তিনি এই মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটুাশান গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। মিশনারী প্রতিষ্ঠানের বা হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে শিক্ষা পেয়ে জাতীয় মনোভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই প্রতিষ্ঠানের মত ভারতীয় স্বত্বাধিকারীর ও ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় এই মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটুাশানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরই সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় ভিত্তির উপর ইংরাজী শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করলেন। এর

ফলে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটলো এবং এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে জাতীয়তাবাদের ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ হল। রাজনীতিবিদ না হয়েও বিদ্যাসাগর এইভাবে রাজনৈতিক জাগরণে সাহায্য করেছিলেন। একথা স্মরণ করা দরকার যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত হলেন এবং ব্যারিষ্টারী করবার অনুমতিও পেলেন না, তখন তিনি ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে বিদ্যাসাগরের এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। ক্রমে আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। দেশের মধ্যে যখন জাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছিল তখন এই প্রতিষ্ঠানটি সে চেতনার বিকাশে অনেক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তরুণদের মনে প্রথমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার ও তাকে শক্তিশালী করার দুটি উপায় হল, সংবাদপত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা পরে আলোচনা করা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাবিধ কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি খুবই প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর মেট্রোপলিটান ইনষ্টিট্যুশানের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি নবজাগ্রত দেশপ্রেমকে সযত্নে লালন করেন। অতএব পরবর্ত্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটি যে বিদ্যাসাগরের নামে নামকরণ করা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত হয়েছিল।

একজন স্রষ্টা, নির্ম্মাতা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল তাৎপর্য্যপূর্ণ। বস্তুতঃপক্ষে বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে তিনি এক বিশিষ্ট্য স্থান অধিকার করে আছেন। তার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্য আধুনিক সৃজনধর্ম্মী পর্য্যায়ে প্রবেশ করল।

প্রথম ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের স্থান ছিল একেবারেই গৌণ,—বস্তুতঃপক্ষে সাহিত্যিক গদ্য বলতে কিছুই ছিল না। বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটে ব্রিটিশ যুগে এবং তা প্রধানতঃ বিদেশীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। মুখ্যতঃ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলা গদ্য লিখতে এবং ছাপতে আরম্ভ করেন। এদের পুরোভাগে ছিলেন বিখ্যাত যাজক উইলিয়াম কেরী। তিনিই বাংলা গদ্য লেখার প্রেরণা যোগান। তারপরে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এইখানে তরুণ ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা করতে হত। কেরী ছিলেন এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। কিন্তু বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব বাংলা শিক্ষার পথে অন্তরায় ছিল। অতএব কেরী আটজন পণ্ডিত যোগাড় করলেন এবং পনের বৎসর সময়ের মধ্যে ১৩টি বাংলা গদ্যপুস্তক রচনা করালেন। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন রায় আধুনিক বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনা করেন, সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিতর্কমূলক রচনা ও তাঁর সাময়িক পত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'র মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও বিশেষ করে তার প্রতিভাশালী সম্পাদক

অক্ষয় কুমার দত্তের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অক্ষয় কুমার দত্ত একটি শক্তিশালী গদ্য রচনাশৈলী রচনা করলেন, যার মাধ্যমে ইতিহাস বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় গুরুতর. বিষয়ে লেখা সম্ভব হয়েছিল। এইভাবে বাংলা গদ্যের বিকাশ হতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য যেন বিদ্যাসাগরের লেখনীর যাদুস্পর্শের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সজীব ও প্রকাশব্যঞ্জক করে তুললেন।

বিদ্যাসাগর নিজেও ছিলেন তত্ত্ববোধিনী দলের একজন। তিনি যে রচনাশৈলী প্রবর্ত্তন করলেন তার ফলে বাংলা গদ্য বিশেষভাবে অগ্রসর হলো।

বিদ্যাসাগর ছিলেন মুখ্যতঃ একজন স্রষ্টা একজন নির্ম্মাতা। শিক্ষার ব্যবস্থা তখন ভাল ছিল না, ভাল পাঠ্যপুস্তকও পাওয়া যেত না। বাংলা গদ্য তখনও ভাল করে বিকাশ লাভ করে নি। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে প্রথমে এই দুটি অভাব পূরণ করতে হবে। বাংলা ভাষার কাঠামো তৈরী করে ভাষাকে নানারকম ভাব প্রকাশের উপযুক্ত করে তোলাই ছিল তাঁর প্রথম কাজ। অতএব মৌলিক রচনার পরিবর্ত্তে তিনি প্রধানতঃ অনুবাদ ও অন্য পুস্তক রচনার দিকে ঝুঁকলেন। তাঁর নিজের মৌলিক রচনার মধ্যে ছিল বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুটি পুস্তিকা, বহু বিবাহ নিরোধ বিষয়ে দুটি পুস্তিকা, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বড় প্রবন্ধ এবং আরও কিছু কিছু লেখা। শেষোক্ত লেখাগুলি তিনি ছদ্মনামে লিখেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও শ্রান্তিহীন কর্ম্মক্ষমতার সমন্বয় হয়েছিল তা দেখে আমাদের বিস্ময় জাগে। তিনি ছিলেন

অত্যন্ত আগ্রহশীল পাঠক। তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহশালায় ভালো ভালো বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দী পুস্তক ছিল। যেমন তাঁর রচনাশৈলী ছিল নিখুঁত তেমনি তাঁর লেখায় ছিল দক্ষতা। প্রয়োজনের চাপে তাঁকে অনেকগুলি শিশুপাঠ্য ও অন্যান্য পাঠ্য পুস্তক লিখতে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন শিল্পী। তাঁর রচিত মোট গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক।

বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি' (১৮৪৭) 'বৈতাল পচ্চিশী' নামে একটা হিন্দী পুস্তকের ভিত্তিতে রচিত। বইটি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক মনোনীত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয় নি ; পরে শ্রীরামপুর মিশনের মার্শম্যান সাহেবের বিশেষ প্রশংসায় সেটা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বাধা উত্তীর্ণ হলেন। এরপরে বিদ্যাসাগর ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪৮) এবং 'জীবন চরিত' (১৮৪৯) নামে দুটি পুস্তক লিখলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে শিশুদের পাঠ্য পুস্তক 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'কথামালা' (১৮৫৬) ও 'আখ্যান মঞ্জরী' (১৮৬৩) প্রকাশ করলেন। কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় দান ছিল 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। এই দুইখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক শতাধিক বৎসরেরও বেশী বাংলার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। 'বর্ণ পরিচয়ে'র জনপ্রিয়তা ছিল অসীম, বাংলার প্রতি গৃহে শিক্ষার অঙ্গ হয়ে পড়েছিল এই বই দুটি। বই দুটিতে বাংলা বর্ণ পরিচয়ের সহজ অথচ সুসম্বদ্ধ প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হয়।

বিদ্যাসাগর কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র ভিত্তিতে

শকুন্তলা' (১৮৫৪) ও ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে'র ভিত্তিতে 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) লিখেছিলেন। বই দুখানি পড়লে মৌলিক রচনা বলে মনে হয়। এই বই দু'টিতে বিদ্যাসাগরের শিল্পী মনের পরিচয় রয়েছে। তাঁর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও শিল্পবোধ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই বই দুটিতে। এখানে দেখতে পাই বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের কোলাহলময় ও ধুলিধূসর বাদানুবাদের ক্ষেত্র থেকে মুক্ত হয়ে প্রাচীন মহান সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও মহিমার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি 'কুমারসম্ভব', 'কাদম্বরী' 'মেঘদূতম্', 'রঘুবংশম' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন খ্যাতনামা গ্রন্থ সম্পাদন করেছিলেন। কঠিন সংস্কৃত ভাষা এবং এই ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত্ব করতে ছাত্রদের অনেক বছর লাগত। ফলে ভারতের এই অমূল্য প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চায় তারা নিরুৎসাহ বোধ করতো। সেইজন্য তিনি 'সংস্কৃত ব্যাকরণের 'উপক্রমণিকা' (১৮৫১) এবং চার খণ্ডে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১৮৫৩, ১৮৫৪ ও ১৮৬২) লিখে সংস্কৃত ব্যাকরণকে সরল ও সহজবোধ্য করেছিলেন।

সেকস্‌পীয়ারের 'কমেডি অব এররস্' অবলম্বনে 'ভ্রান্তি বিলাস' লিখে বিদ্যাসাগর দেখালেন তাঁর সাহিত্যিক রুচি কত ব্যাপক ছিল।

বিদ্যাসাগর লিখিত বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ সম্বন্ধে চার খানি গবেষণামূলক পুস্তিকা এবং তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ (১৮৫৩) বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের একটা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর আত্মজীবনী

লিখতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু দুটি অধ্যায়ের বেশী লিখতে পারেন নি। এর মধ্যে তাঁর জন্ম, পিতৃপরিচয় এবং শৈশব জীবনের কথা লেখা আছে।

ছদ্মনামে লিখিত কয়েকটি পুস্তক বিদ্যাসাগরের দ্বারা রচিত বলে মনে করা হয়, যেমন 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪) ইত্যাদি। লেখার ধরণ ও ভাষা দেখে ও সমসাময়িক কয়েকজন ব্যক্তির প্রামাণিক বিবৃতি অনুসারে মনে করা হয় যে, বিদ্যাসাগরই এই বইগুলির রচয়িতা ছিলেন। এই পুস্তকগুলি ছিল প্রধানতঃ বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ সম্পর্কে তর্কবিতর্কমূলক ব্যঙ্গ রচনা। বিদ্যাসাগরকে এই পুস্তকগুলিকে ব্যঙ্গ করে যে সব অজস্র গালি দেওয়া হয়েছিল, তিনি তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। এই বইগুলির ভাষা তাঁর গবেষণামূলক পুস্তিকার মত নয়! এগুলি হালকা সুরে রচিত, স্থানে স্থানে কথ্য ভাষায় সহজ শৈলী।

বিদ্যাসাগর অবিসংবাদিতভাবে বাংলা গদ্যের স্রষ্টা ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের আগে বাংলা গদ্য ছিল একেবারে সংস্কৃত ঘেঁষা, ক্লান্তিকর ভাবে দীর্ঘ ও শব্দবহুল। আধুনিক ভাষার সাবলীলতা, সৌন্দর্য্য ও সহজ বাচনভঙ্গী কিছুই বাংলা গদ্যে ছিল না। অক্ষয় কুমার ইত্যাদির মত তত্ত্ববোধিনী দলের লেখকেরা, বাংলা ভাষাকে সাবলীল করার ব্যাপারে যেসব অসুবিধা ছিল, সেগুলি দূর করতে সুরু করে-ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরই সুষ্ঠুভাবে শব্দ ব্যবহার করে ভাষার দুর্বোধ্যতা দূর করলেন। সাহিত্য এবং অন্যান্য বাস্তব বিষয় প্রকাশের উপযোগী করে ভাষাকে গড়ে তুললেন।

বিদ্যাসাগর যে বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন

করলেন তা নয়। বরং সংস্কৃত শব্দের এমন যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করলেন যে, ভাষা আর দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য রইল না। শুধু তাই নয়, ভাষা সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হয়ে শক্তিশালী ও স্পষ্টরূপে ভাব প্রকাশের উপযোগী হল। সংক্ষেপে বলা যায় তিনি সাধু ভাষার মান নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে আর্ল অব রোণাগুসে বলেছিলেন, "যে কাজে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা কৃতকার্য হতে পারেন নি, সেই কাজে বিদ্যাসাগর সফল হলেন। কারণ বাংলা ভাষার বুনুনীর মধ্যে তিনি সংস্কৃত শব্দকে এমনভাবে সন্নিবেশ করলেন যে ভাষা হাস্যকর ভাবে গুরুগম্ভীর না হয়ে ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠল।" বিদ্যাসাগর যে কেবল বাংলাভাষায় ছেদ চিহ্ন প্রবর্ত্তন করলেন তাই নয়, তিনি পদবিন্যাস ও বাক্যগঠন প্রণালীকে যুক্তিসঙ্গত রূপ দিয়ে সহজবোধ্য করে দিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সুসম শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করে সুসম্বদ্ধ ও শিল্পময় গদ্যশৈলী প্রবর্ত্তন করেন। ভাষাকে তিনি যে রকম সুন্দর করলেন তা একমাত্র শিল্পী মনের পক্ষেই সম্ভব।

ভাষা সংস্কার করে বিদ্যাসাগর এই ভাবে বাংলা গদ্যের বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন সুলেখক ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতভেদ ছিল এবং বিদ্যাসাগরের রচনার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে প্রথম জীবনে তাঁর মনে সংশয় ছিল। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে বাংলা গদ্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যা সৃষ্টি করেছিলেন তাই ছিল তাঁর নিজের এবং সমসাময়িক লেখকদের প্রধান অবলম্বন। বিদ্যাসাগরী রীতি বা সাধুভাষার বিরুদ্ধে

একটা প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্যারীচাঁদ বইটি টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে লেখেন। সংস্কৃত ঘেঁষা রীতি বর্জ্জন করে সম্পূর্ণভাবে কথ্যভাষায় এই বইটি লেখা হয়েছিল। বঙ্কিম বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করেছিলেন। তবে শেষের দিকে তাঁর ভাষা যতটা সম্ভব সরল হয়ে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষার মত হয়েছিল।

ভাষার এই বিবর্ত্তনে বিদ্যাসাগর শক্তি ও গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। তা না হলে ভাষা এত দ্রুত অগ্রসর হতে পারত না। শিক্ষা, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য, সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কারক।

বিদ্যাসাগর সাংবাদিক ছিলেন না। সংবাদপত্রের যা প্রধান উপজীব্য অর্থাৎ রাজনীতি, তার সঙ্গেও তাঁর কোনও সংস্রব ছিল না। তবুও তিনি নানাবিধ কাজের দ্বারা সাংবাদিকতার পরিপোষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা সাংবাদিকতা তখন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্শন' থেকে সুরু করে অনেকগুলি বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩১ থেকে ১৮৪০—এই দশ বছরের মধ্যে ৩০টি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, সবগুলি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু এই পত্র পত্রিকাগুলির প্রকাশ থেকে জানা যায় যে তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক চেতনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য

ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া বন্ধু মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় তিনি 'সর্ব্বশুভঙ্করী পত্রিকা' নামে একটা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। এ পত্রিকা অবশ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। ১৮৫৮ সালে তিনি বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সহায়তায় 'সোমপ্রকাশ' নামে আর একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আল অব রোণাণ্ডসে বলেছিলেন, "এই পত্রিকা বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা নূতন পরিমার্জ্জিত ভাব এনেছিল।" বাঙালী সমাজের উপর এই পত্রিকার খুব প্রভাব পড়েছিল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন এর সম্পাদক। বিদ্যাসাগর নানাভাবে সাহায্য করে এই পত্রিকাটিকে শক্তিশালী প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জীর যখন মৃত্যু হয়, তখন ঐ ইংরাজী সংবাদপত্র পরিচালনার ভার বিদ্যাসাগরের উপর এসে পড়ে এবং তিনি কেষ্টদাস পালকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই সংবাদ পত্রটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল এবং সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই এর সুনাম ছিল। পরবর্ত্তীকালে কেষ্টদাস পালের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় বিদ্যাসাগর এর সংস্রব ছেড়ে দেন।

এই দুটি পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে সাংবাদিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে সংবাদপত্রের কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অন্যান্য সাময়িক

পত্রিকাগুলি রাজনীতির মত গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করতো না। সেগুলি প্রধানতঃ সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করতো। কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' প্রধানতঃ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতো।

বিদ্যাসাগরের রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি যে সব পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা থেকেও কিছু জানা যায় না। কিন্তু সাংবাদিকতাকে তিনি সর্ব্বদাই সমর্থন করতেন। কারণ সংবাদপত্রের মধ্য দিয়েই সমাজের প্রগতিশীল অথচ সংযত মত প্রতিফলিত হয়। ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান গঠিত হয়। এই এ্যাসোসিয়েশানের উদ্যোক্তা-দের মধ্যে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর মত ব্যক্তিরা বিদ্যাসাগরকে এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করার প্রস্তাব করেন। ক্রমশঃ স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছিল বলে বিদ্যাসাগর এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তবে রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য এই রকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ অনুমোদন করেছিলেন।

জীবন্ত কাহিনী

বিদ্যাসাগরের অন্তরে অপরের জন্য অসীম সহানুভূতি ছিল। তিনি বহু লোককে দান করতেন। তাঁর চরিত্রে গভীর মানবতাবোধ ছিল। এমন কি তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে নিয়ে নানারকম গল্প প্রচলিত হয়েছিল। এটা যে কেবল তাঁর সমাজ সংস্কার কাজের জন্য হয়েছিল তা নয়। তাঁর অসীম দয়ার জন্যও লোকে তাঁকে নিয়ে অনেক গল্প সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই দয়ার জন্য লোকে ভালবেসে তাঁর নাম দিয়েছিল 'দয়ার সাগর'। বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন খুব সরল ও অনাড়ম্বর। কিন্তু অপরের জন্য খরচ করার সময় তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। এই ব্যয় এত অজস্র ছিল সে একে প্রায় দোষাবহ বলা যেতে পারত। কোনও অভাবগ্রস্ত বা বিপন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে কখনও নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না। শত শত দরিদ্র ছাত্র, পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা ও অসহায় বিধবা বিদ্যাসাগরের দানের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করত। বোধহয় বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কেউ বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য নিজে ঋণগ্রস্ত হওয়ার দুঃসাহস করবেন না। কিন্তু এই দুঃসাহস ছিল বিদ্যাসাগরের অভ্যাসগত। এমন কি চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ার পর যখন তাঁকে শুধু তাঁর ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশের আয়ের উপর নির্ভর করতে হত, তখনও তাঁর দানশীলতা আগের মতই অব্যাহত ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হয়েছে। এই মাইকেলকে বিদ্যাসাগর যে ভাবে সাহায্য করেছিলেন তা তাঁর বদান্যতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে। মাইকেলের

অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' বাংলার কবিতার জগতে বিপ্লব এনেছিল। এই 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' রচয়িতা মাইকেল একদা ভার্সাই সহরে তাঁর ফরাসী স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন, এবং ঋণের জন্য প্রায় কারাবাসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যখন বাংলা দেশের কেউ মাইকেলের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না তখন মাইকেল বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখলেন এবং তাঁর শোকার্ত্ত স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন যে, এবার তিনি যে ব্যক্তির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছে "প্রাচীন ঋষির প্রতিভা ও জ্ঞান, ইংরাজের কর্ম্মশক্তি ও বাঙালী মায়ের কোমল হৃদয়।" মাইকেল ঠিকই বলেছিলেন,—তাঁর আবেদন ব্যর্থ হল না। মাইকেলের এই করুণ পত্রে বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে সঙ্কল্প করলেন যে, তিনি কবিকে বিদেশে দুর্দ্দশা ও মর্য্যাদাহানির হাত থেকে বাঁচাবেন। মাইকেলের বন্ধু ও হিতৈষীদের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বিফল মনোরথ হলেন। অতএব তিনি দেড় হাজার টাকা ঋণ করে কবিকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখানেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটল না। যতদিন না মাইকেল ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সফল হলেন ততদিন পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর সেই স্বভাবতঃ অমিতব্যয়ী কবিকে টাকা পাঠাতে লাগলেন। এবং এর জন্য তিনি বেপরোয়াভাবে ঋণ করতে লাগলেন। একথা ভাবলেন না যে অসংযমী কবি হয়ত কোনদিনই সেই টাকা ফেরৎ দিতে পারবেন না। মাইকেল ছিলেন কবিতার জগতে বিদ্যাসাগরের প্রতিরূপ। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। পুরাতনের ধ্বংশাবশেষ থেকে মাইকেল নূতন কাব্যরূপ সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন

বিদ্যাসাগর গদ্যের জগতে নূতন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা দুজনে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করেছিলেন। এই দুই বিদ্রোহীর পরস্পরের মধ্যে একটা সহানুভূতির বন্ধন অন্তর্নিহিত ছিল। অনেকে মাইকেলকে শুধু যে এড়িয়ে চলতেন তাই নয়, এমন কি ঘৃণা করতেন, কেননা তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন।

বিদ্যালয়ে পড়বার সময় বিদ্যাসাগর নিজের বৃত্তির অর্থ দিয়ে সহপাঠীদের জন্য সুন্দর সুন্দর পোষাক কিনে দিতেন কিন্তু নিজে হাতে বোনা মোটা সূতার পোষাক পরতেন। প্রথম জীবনে সহপাঠীদের প্রতি এই সহানুভূতি পরবর্ত্তী জীবনে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল। জীবনের প্রারম্ভ কাল থেকে সুরু করে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজের হাতে অসংখ্য রোগীর সেবা করেছিলেন। তিনি রাস্তা থেকে কলেরা রোগীকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার সেবা করেছিলেন। এই সেবা কার্য্যে তাঁর কোনও কুসংস্কার বা জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনরকম ভেদজ্ঞান ছিল না। কারমাটারের (বিহারের সাঁওতাল পরগণার অন্তর্ভুক্ত) সাঁওতালরা ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। কারমাটারে বিদ্যাসাগরের একটা বাড়ী ছিল, সেখানে মাঝে মাঝে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিশ্রাম করতে যেতেন। তিনি ওখানকার সাঁওতালদের নানাভাবে সাহায্য করতেন, এমনকি তাদের জন্য একটা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে অনুন্নত আদিবাসীদের উন্নয়নের কাজে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। এই উন্নয়নের কাজই এখন স্বাধীন ভারতের অন্যতম আদর্শ। একবার বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য খুব

খারাপ হয়ে পড়ে। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে কারমাটারে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তা শুনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত করুণভাবে কাঁদতে লাগলেন, বললেন সেখানে যাওয়ার মত যথেষ্ট অর্থ তাঁর নেই। বন্ধুকে বুঝিয়ে বললেন যে, যেখানে অসংখ্য সাঁওতালরা উপবাসে দিন কাটায় সেখানে গিয়ে তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন না, অথচ তাদের সকলকে পেট ভরে খাওয়ানোর মত অর্থ তাঁর নেই।

সংগঠিতভাবে জনহিতকর কার্য্যের কথা আজ থেকে বহুদিন পূর্ব্বে সেই যুগে তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। ১৮৬৬-৬৭ সালে বাংলাদেশে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন গভর্ণমেণ্টের সহযোগীতায় মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। সরকারী চেষ্টায় সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি বে-সরকারী প্রচেষ্টার নূতন আদর্শ স্থাপন করলেন। তাঁর নিজ গ্রামে ঐ রকম একটা খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খুললেন সম্পূর্ণ নিজের খরচে। এই ভাবে কত মানুষ যে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তা ধারণা করা যায় না। তবে তা নিশ্চয়ই অসংখ্য ছিল। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেই কেন্দ্রটিতে চার পাঁচ মাস ধরে কাজ চলেছিল এবং প্রতিদিন বারোজন পাচক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করত। আবার এক সময় বর্দ্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়া রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং শত শত লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। তখন বিদ্যাসাগর গভর্ণমেণ্টকে রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং নিজেও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়

খোলার ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা ও পথ্য বিষয়ে দেখা-শোনা করতেন। শোনা যায় যে, ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি সানন্দে পীড়িত মুসলমান শিশুকে বুকে তুলে আদর করেছিলেন। দরিদ্র রোগীদের সেবাকায্যে তাঁর মধ্যে গান্ধীজির পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। গান্ধীজিও কুষ্ঠরোগীকে সেবা করতে ইতস্ততঃ করেন নি।

বিদ্যাসাগর অন্য জাতি বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ ছিল,—যে জন্য তাকে স্বতন্ত্রতাবাদী বলে মনে হতে পারে। তাঁর এই সঙ্গত জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ছিল তাঁর পোষাকে, একটি ধুতি, চাদর ও একজোড়া চটি। তাঁর এই সাধারণ পোষাক শুধু যে তাঁর নিজের দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণের প্রতীক ছিল তাই নয়, তাঁর দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্যেরও প্রতীক ছিল। তাঁর এই পোষাককে তিনি ভারতবাসীর জাতীয় পোষাক বলে মনে করতেন এবং কোনও কারণেই এই বেশবাস ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। তিনি এই বেশে এবং সামান্য একজোড়া চটি পায়ে দিয়ে অনেক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন—এমনকি লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের সঙ্গেও। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শুধু গান্ধীজীরই তুলনা করা চলে। বড়লাটের প্রাসাদে কটিবস্ত্র পরিধান করে ও সামান্য চপ্পল পায়ে দিয়ে যাওয়ার মত নৈতিক সাহস একমাত্র গান্ধীজীরই ছিল।

একবার কি দু'বার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডের বিশেষ অনুরোধে বিদ্যাসাগর আনুষ্ঠানিক পোষাক পড়ে লাট ভবনে

গিয়েছিলেন, কিন্তু হ্যালিডের কাছে তিনি এই বেশবাস সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অপছন্দের কথা ব্যক্ত করেন। হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের এই প্রশংসনীয় নৈতিক প্রত্যয় দেখে তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত পোষাক পরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

একবার বিদ্যাসাগর তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ও কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম পরিদর্শন করতে যান। কিন্তু তাঁর চটির জন্য সেখানে তাঁকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়। তিনি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত চটি নিয়ে আর একটা খুব মজার গল্প আছে। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন. তখন একবার কলেজের কার্য্যোপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের বৃটিশ অধ্যক্ষ মিঃ কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি যখন মিঃ কারের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে ভদ্রভাবে স্বাগত করা দূরে থাক, মিঃ কার সামনের টেবিলের উপর পা ছড়িয়ে জাঁক করে বসে রইলেন। এই অহেতুক অপমানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন। পরে কোনও দিন একটা জরুরী বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মিঃ কারকে বিদ্যাসাগরের ঘরে আসতে হল। বিদ্যাসাগরকে মিঃ কার ইতিপূর্ব্বে যতটুকু সৌজন্য দেখিয়েছিলেন এবারে বিদ্যাসাগর তার চেয়ে একটুও বেশী ভদ্রতা করলেন না—তিনিও তাঁর চটি শোভিত পদযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করে শক্ত হয়ে চেয়ারে বসে থাকলেন। একজন দেশী পণ্ডিতের এই স্পর্ধা দেখে কলকাতার প্রধান কলেজের ইংরেজ

অধ্যক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং শিক্ষা পরিষদের সচিব মিঃ মউয়াটের কাছে পণ্ডিতের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। মউয়াট বিদ্যাসাগরের স্বভাব খুব ভালভাবেই জানতেন। তাঁর অনুসন্ধানের উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, "একজন অর্দ্ধ সভ্য নেটিভ হিসাবে আমি মনে করলাম যে, মিঃ কার আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছিলেন তাই হচ্ছে সভ্য ইয়োরোপীয় সৌজন্য। অতএব তিনি যখন আমার ঘরে এলেন তখন আমি কেবলমাত্র তাঁকে সেইরকম সৌজন্যই দেখিয়েছি।" এই ঘটনাটা বিদ্যাসাগরের জাতীয়তাবোধের এবং একজন উদ্ধত বিদেশীর অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচায়ক। সে বিদ্রোহ অবশ্য তাঁর নিজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিদ্রোহ।

বিদ্যাসাগরের চটি তাঁর গভীর জাতীয় চেতনা, অদম্য স্বাধীনতাবোধ, অবিচলিত নৈতিক সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এই সব গল্প থেকে তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের কথা জানা যায়। একবার এক ভদ্রলোক কারমাটার রেল ষ্টেশনে নেমে কুলী ডাকাডাকি করছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটা মাত্র ছোট ব্যাগ ছিল এবং তারই জন্য তিনি কুলীর প্রয়োজন বোধ করছিলেন। সামান্য একটা কাপড় পরা এক ব্যক্তি হঠাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হল। ঠিক একটা কুলী যে ভাবে মাল তুলে নেয় সেইভাবে লোকটা ভদ্রলোকের ব্যাগ তুলে নিল এবং প্লাটফর্মের বাইরে পর্য্যন্ত পৌঁছে দিল। সেখানে পাল্কী অপেক্ষা করছিল। পাল্কীতে চড়ে ভদ্রলোক লোকটাকে তার মজুরী স্বরূপ দুটি পয়সা দিতে গেলেন। তখন কুলীটি উত্তর দিল, "আমাকে

পয়সা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। একটা ছোট ব্যাগ কেমন করে নিয়ে যাবেন ভেবে আপনি চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন দেখে আমি আপনাকে একটু সাহায্য করলাম মাত্র। আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একথা শুনে ভদ্রলোকটির সে কি অবস্থা হ'ল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সেখানে অনেক ভাল ভাল পুস্তকের সংগ্রহ ছিল। একদিন একজন ধনী অভিজাত ব্যক্তি একটি পাঁচশত টাকা মূল্যের শাল গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। কথাবার্ত্তা বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোকটি বিদ্যাসাগরকে প্রশ্ন করলেন, "এত দাম দিয়ে এই বইগুলি বাঁধিয়ে রাখার প্রয়োজন কি?" বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "পাঁচ সিকি দামের একটা কম্বল দিয়েও যখন শীত নিবারণ করা যায় তখন আপনি এত দামী শাল গায়ে দিয়েছেন কেন?" বিদ্যাসাগর বিত্তের বা তথাকথিত আভিজাত্যের অহঙ্কার সহ্য করতে পারতেন না।

অনেক সময় বিদ্যাসাগরের দানশীলতা বিচিত্র এবং অপ্রত্যাশিত পথে প্রবাহিত হত। তাঁর বেশীরভাগ দানই ছিল অনাড়ম্বর এবং প্রায় লোকচক্ষুর অগোচর। হয়ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তিনি পাশ্ববর্তী কোনও বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন, অমনি তিনি সে বাড়ীতে প্রবেশ করে দুঃস্থ পরিবারকে কিছু অর্থ সাহায্য করে চলে এলেন। তিনি রাস্তা থেকে ভিক্ষুক ও অনাথদের তুলে নিয়ে এসে তাদের সাহায্য করতেন। একবার মধ্যরাত্রির পর বিদ্যাসাগর কলকাতার পথে হাঁটছিলেন। শীতকালের ঠাণ্ডা রাত্রি, পথে কয়েকজন বারাঙ্গনা সেই

অসময়েও রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকের জন্য অপেক্ষা করছিল রোজগারের আশায়। বিদ্যাসাগর তাদের কাছে গিয়ে বললেন, "মায়েরা, এই টাকা নাও, তোমাদের নিজের নিজের ঘরে ফিরে যাও, এই ঠাণ্ডায় আর এখানে অপেক্ষা করোনা।"

অনেক পরিশ্রমসাধ্য কাজ ও নানা সমস্যার মধ্যেও বিদ্যাসাগর কখনও তাঁর স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তা হারাতেন না। তিনি গম্ভীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হলেও সামাজিক ছিলেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করে কিছু সময় কাটাতে ভালবাসতেন। এক কথায় বলা যায় যে, তিনি ছিলেন খুব মিশুক প্রকৃতির লোক অর্থাৎ কোনও ক্লাব বা সঙ্ঘের সভ্য হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের সকলের বাড়ীতে পালা করে ভোজ খাওয়া। একবার জবরদস্ত খাওয়া-দাওয়া হয় এবং অতি ভোজন করে একজন সদস্য পীড়িত হয়ে পড়েন। অন্য সদস্যরা বললেন, এঁর হজম শক্তি এমন দুর্ব্বল যে, এই ভোজন-সঙ্ঘের সদস্য থাকার অনুপযুক্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি বললেন, ভদ্রলোক এত ভোজনপ্রিয় যে যদি প্রাণ যায় তবুও তিনি খেয়েই মরবেন অতএব তিনি এই সঙ্ঘের সদস্য থাকার বিশেষ উপযুক্ত।

একজন সব-জজকে নিয়ে একটা গল্প আছে। ভদ্রলোক বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগর বললেন, "স্বর্গের দরজা আপনার জন্য এখন সম্পূর্ণভাবে খোলা হয়ে গেল।" সব-জজ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে এর কারণ জানতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর বললেন, "স্বর্গের প্রবেশ পথে একজন

দ্বাররক্ষক আছে, সে সকলকে প্রশ্ন করে যে, পৃথিবীতে সে ভাল কাজ করেছে না মন্দ কাজ করেছে। যারা ভাল কাজ করেছে তারা সোজা স্বর্গে চলে যায় এবং যারা পাপ কাজ করেছে তারা যায় নরকে। একবার এক ব্যক্তিকে নিয়ে দ্বাররক্ষক বেশ মুস্কিলে পড়ে গেল, কারণ সে বিশেষ ভাল কাজও করেনি আবার ঠিক খারাপ কাজও করেনি। আরও জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে, লোকটি বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। তখন দ্বারী তৎক্ষণাৎ তাকে স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলল, পৃথিবীতে থাকতেই আপনার নরকবাসের অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে গেছে। অতএব আপনি এখন স্বর্গেই আসুন", সব-জজ তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন।

এখানে আর একটি গল্প বলা যেতে পারে। একদিন বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে একজন বললেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বিদ্যাসাগরের গালাগালি করতে শুনেছেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "কেন, আমি ত তার কোনও উপকার করি নি?" মানুষের অকৃতজ্ঞতা তাঁর কাছে এমন স্পষ্ট ও নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, জীবনের শেষ ভাগে এই একনিষ্ঠ সমাজ সংস্কারক বোধহয় একটু ব্যর্থতাজনিত হতাশা বোধ করতে সুরু করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে অসংখ্য কাহিনী প্রচলিত আছে। তার অনেকগুলিই হয়তো জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা ঠিক যে, কোনও সাধারণ মানুষকে নিয়ে এত গল্প প্রচলিত হতে পারে না। একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই ধরনের কাহিনী গড়ে ওঠে।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তির বিচিত্র, জটিল ও অনেকাংশে দুর্বোধ্য চরিত্রের সঠিক পরিমাপ করা সহজ নয়। বিশদভাবে দেখলে মনে হয় তাঁর চরিত্রে অনেক আপাতঃ বিরোধী গুণের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁর জন্ম ও লালনপালন হয় রক্ষণশীল পরিবারে, যেখানকার আবহাওয়া ছিল সনাতন। বহু যুগের পুরানো সংস্কারের প্রাধান্য ছিল তার পরিবারে ও পরিবেশে। অথচ তিনি নিজে সমস্তরকম গোঁড়ামী থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন কতকগুলি বিশেষ প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন ভাবধারা ও প্রগতি দেখা দিয়েছিল সেই ভাবধারা এই ঋষিকল্প পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার উপযুক্ত পথ পেয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, অথচ শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত আধুনিক ছিল। বেশীর ভাগ মধ্যযুগীয় সমাজ যখন আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার মুখোমুখি হয়, তখন সে সমাজের লোকেরা আধুনিক ভাবধারা থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর সে রকম ছিলেন না। তিনি নূতন আলোর গতি রুদ্ধ করতে চান নি। এক কথায় তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে যাচাই করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হলে তিনি কোনো জিনিষ গ্রহণ করতেন না।

একবার যে কাজকে তিনি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতেন, কঠিন বাধাবিঘ্ন এলেও তিনি সে কাজ থেকে বিরত হতেন না।

তাঁর ইচ্ছাশক্তি ছিল বলিষ্ঠ ও অনমনীয়। তাঁর চরিত্র ছিল নির্ভীক ও স্বাধীন।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে বিদ্যাসাগর সমসাময়িক সমাজ জীবনে বিভিন্ন প্রচেষ্টার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তিনি ব্যক্তিগত সুবিধালাভের জন্য বা ভয়ে নিজের নীতির সঙ্গে আপোষ করে চলেন নি। তিনি বরং একলা কাজ করবেন তবু মাঝপথে কাজ অসমাপ্ত রাখতে রাজী ছিলেন না। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় অনেক বন্ধুরই উৎসাহ কমে গেল, অনেকেই সহযোগীতা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা রাখলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনের সমস্ত ভার প্রায় একলাই বহন করলেন। তাঁর এই আপোষহীন স্বভাবের জন্য হয়ত তাঁর পারিবারিক অশান্তি দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

তিনি শেষ বয়সে কি ভাবে তাঁর জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করলেন সে কাহিনী এখানে উল্লেখযোগ্য। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি একজন বিধবাকে বিবাহ করার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। বিদ্যাসাগর তখন বীরসিংহ গ্রামে অবস্থান করছিলেন। প্রথম দিকে তিনি এ বিবাহের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু গ্রামের কয়েকজন দায়ীত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ কিছু খবর শোনার পর তিনি আর এ বিবাহ সমর্থন করলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাইদের মধ্যে কয়েক জন স্থানীয় লোকেদের সাহায্যে এই বিবাহ সম্পন্ন করান। বিদ্যাসাগরের পৈতৃক বাসভবনের

কাছেই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর এত দুঃখিত ও অপমানিত হন যে, তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যান এবং আর কখনও সেখানে ফিরে যান নি।

বিদ্যাসাগর জীবনে বহু ইংরাজের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মহৎ চরিত্রের জন্য তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করেন। বাকল্যাণ্ড বলেছেন, "বিদ্যাসাগর যেমন নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন তেমনই সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে ব্যবহারে অমায়িক ও শিশুর মত সরল ছিলেন।" ব্রিটিশ শাসকবর্গের ব্যবহারে তিনি কখনও নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নি। পরাধীন দেশের একজন নাগরিকের পক্ষে এরকম চারিত্রিক স্বাধীনতা সত্যই বিরল।

বিদ্যাসাগর বিদ্বান, লেখক ও চিন্তাশীল ছিলেন, আবার তাঁর কর্ম্মশক্তিও ছিল অসীম। মানবসেবা ও নানাবিধ কর্ম্মে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের মত তাঁর শরীর ক্ষীণকায় হলেও তাঁর মধ্যে ছিল পশ্চিমের পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা ও অদম্য কর্ম্মশক্তি। তিনি প্রাণপাত করে অক্লান্তভাবে কাজ করতেন। তাঁর স্বাস্থ্য যে দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল সে দিকে নজর দেওয়ার কোনও সময় তাঁর ছিল না। বাংলাদেশের ভাবপ্রবণ ও কোমল আবহাওয়ায় কি করে এমন একটি পরাক্রমশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

অথচ এই দৃঢ় পুরুষোচিত মানুষটি ছিলেন শিশুর মত সরল আর বাঙালী মায়ের মত কোমল হৃদয়। এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, তাঁর মত লোক মাঝে মাঝে কাঁদতেন। কিন্তু

এ কথা সত্য। তাঁর সমসাময়িক বহু লোকের বিশ্বস্ত বিবৃতি থেকে এ কথা জানা যায়। মানুষের দুঃখে তিনি এমন গভীর-ভাবে অভিভূত হতেন যে, শিশুর মত ক্রন্দন করতেন। তাঁর বদান্যতার কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে তাঁর লোকহিতৈষণার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় না ; সেই লোকহিতৈষণা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব ধরনের। সে যেন এক কোমল স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসারণ। অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন অযৌক্তিক, বাছবিচারহীন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা বা বিবেচনা না করে তিনি অপরকে সাহায্য করতেন ; এমন কি গ্রহীতা জাল, অথবা সত্যই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত কিনা, এ বিচারও তিনি করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি অসাধু ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, একেবারে দান না করার চেয়ে বরং দান করে প্রতারিত হওয়া ভালো।

তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল এই যে তিনি ধর্ম্ম ও সমাজের বিধিনিষেধের জন্য তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা বর্জ্জন করতেন না। জীবনের প্রথম দিকে তিনি উগ্র সংস্কারবাদী 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের বন্ধু ছিলেন। তাদের সঙ্গে অন্য কোনও ব্যাপারে মিল ছিল না। তবুও তিনি সেই সমাজ বিপ্লবীদের প্রগতিশীল মনোভাব সমর্থন করতেন। অবশ্য প্রগতির নামে তারা যে, নিজেদের আচার-আচরণে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেন সেটা বিদ্যাসাগর সমর্থন করতেন না। তত্ত্ববোধিনী দলের এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের

ঘনিষ্ঠতা স্মরণীয়। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য তাঁর মধ্যে কিছুটা সুপ্ত ছিল। এই তত্ত্ববোধিনী দলের প্রগতিবাদের সংস্পর্শে এসে তা জাগ্রত হয়ে উঠল। তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে অনেক পরিমাণে এই দলের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্ম নেতা ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেন। বাংলা দেশের একজন ধর্ম্ম নেতা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যাসাগরের নিকটে অভিযোগ করেন যে, তাঁর (বিদ্যাসাগরের) উৎকৃষ্ট শিশু পাঠ্য 'বোধোদয়' পুস্তকে অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ থাকলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে সে পুস্তকে কোনও পাঠ নেই। বিদ্যাসাগর এই ত্রুটি লক্ষ্য করে বইটির পরবর্ত্তী সংস্করণে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি পাঠ সংযোগ করলেন। কিন্তু তার প্রথম বাক্য ছিল, "ঈশ্বর নিরাকার চেতনা স্বরূপ।" সহজেই বোঝা যায় এটা ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা গৃহের প্রতিধ্বনি।

বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন? তা যদি না হয় তবে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি ছিল? অবশ্য তাঁর বিপক্ষের লোকেরা তাঁকে নাস্তিক বলতে দ্বিধা করে নি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের ধর্ম্মমত ও ভগবান সম্বন্ধে ধারণা সম্পর্কে একেবারে নীরব ছিলেন। হাস্যচ্ছলে তিনি বলতেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন না কারণ তাঁর ভয় হয় যে, হয়ত তিনি ভুল বলবেন এবং মৃত্যুর পরে এজন্য ভগবান তাঁকে শাস্তি দেবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সকলের উপরে এক পরম সত্ত্বা আছেন, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্য কোনও বিশেষ পথই যে একমাত্র পথ এ কথা তিনি

বিশ্বাস করতেন না। তিনি চিরাচরিত বিশ্বাস বা বিধান অনুসারে চলতেন না, বরং নিজের প্রত্যয়ে। এই কারণে তিনি অপরের ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেছেন যে, লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তাঁর নিজের পিতামাতাকে তিনি দেবতার মত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। তাঁদের পরিবারে সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই ব্যাপারে কোনও আগ্রহ ছিল না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত কঠোর আচার-অনুষ্ঠান পালন করবারও বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না।

বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন সমসাময়িক; পুনর্জাগরণের দুটি শাখার প্রতিনিধিস্বরূপ। তাঁদের চরিত্রে পুনর্জাগরণের দুটি দিক প্রতিফলিত হয়েছিল। এই দু'জনের চরিত্রের পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনে রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেইমত তিনি ১৮৮১ সালে একদিন বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। পণ্ডিত সাধুর কাছে যান নি। এক্ষেত্রে সাধু মহাত্মাই গিয়েছিলেন পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের অনেক প্রশংসা করলেন। বললেন, যে খাল, বিল, নদী নালা দেখে এবার তিনি এসেছেন 'সাগর' দর্শন করতে। বিদ্যাসাগরও তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখিয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথ সম্বন্ধে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। তাই রামকৃষ্ণের অনুরোধ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান নি। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ছিলেন,

কিন্তু তিনি তাঁকে একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছাড়া আর বেশী কিছু মনে করতেন না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ছিল না দেখে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগরের বিদ্যা আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নেই।"

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর উৎসুক ছিলেন না। তিনি ইহজগৎ ও তার সমস্যা নিয়ে এত ব্যাপৃত ছিলেন যে, অন্য জগতের কথা চিন্তা করার তাঁর সময় ছিল না। অন্য অর্থে, তিনিও একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। বলা যেতে পারে, তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী। বস্তুতঃপক্ষে, বিদ্যাসাগর সঙ্কীর্ণ অর্থে ধার্ম্মিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন দার্শনিক। তিনি কখনও ধর্ম্ম নিয়ে বাদানুবাদ করতেন না। সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিষয়ের কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর নিজের দার্শনিক উপলব্ধি অনুসারে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং তার মধ্যে লোক দেখানোর কোনও চেষ্টা ছিল না। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম ছিল "মানুষের সেবা।" ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তিনি মনে করতেন যে, এই সব আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনকে ব্যাহত করে।

বিদ্যাসাগর পুর্ণজাগরণের প্রথম পর্বের প্রতিনিধি ছিলেন, যে পর্বকে বলা যায় যুক্তিবাদী উদারনীতিক পর্য্যায়। পরমহংস ছিলেন পরবর্ত্তী অর্থাৎ ভাবপ্রবণ পর্য্যায়ের প্রতিনিধি, যার ভিত্তি ছিল ধর্ম্মীয় পুনরুত্থান। অতএব তাঁদের চরিত্রের বৈপরীত্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

একটি যুগের অবসান

বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর জীবনের এই সাত বছর ছিল মহিমাময় প্রচেষ্টা ও সাফল্যের গৌরবে পরিপূর্ণ। সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করবার পর তিনি যে জনকল্যাণের ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন তা মোটেই নয়। স্বভাবতঃ তিনি এত কর্ম্ম-প্রিয় ছিলেন যে কোনও সাফল্য অর্জ্জন করার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারতেন না, তা সে সাফল্য যত গৌরবময় হোক না কেন। সুতরাং সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পরেও তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী একটি অধ্যায়ে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর সম্মানিত সভ্য নিযুক্ত হন। লাইপজিগ সহরের নাগরিকেরা তাঁকে মর্য্যাদা প্রদান করে। তাঁর সমাজ সেবার স্বীকৃতি হিসাবে গভর্ণমেণ্ট ১৮৮০ সালে তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি দান করেন। কিন্তু তিনি নিজে এই উপাধি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না এবং এই উপাধি গ্রহণ করবার জন্য উপস্থিতও হন নি। ১৮৮৩ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে কাশীতে তাঁর মায়ের মৃত্যুতে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পান। পাঁচ বছর পরে তাঁর পিতারও মৃত্যু ঘটে। তাঁর স্ত্রী উদরাময়ে

ভুগছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের দেহাবসানের তিন বছর পূর্ব্বে ১৮৮৮ সালে তিনি মারা যান।

বিদ্যাসাগরের তিন ভাই ছিলেন দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশান। এঁদের সাহায্য করবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগরের এক পুত্র ও চার কন্যা ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র স্ত্রী ও দুটি শিশু সন্তান রেখে অকালে মারা যান। এতে বিদ্যাসাগর আবার গভীর আঘাত পান।

বিদ্যাসাগর তাঁর যৌথ পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে তাদের অনেক অর্থসাহায্য করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পরিবারিক জীবন সুখের ছিল না। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, বিদ্যাসাগরের মত বিখ্যাত স্বামীর ঘটনাবহুল জীবনে তাঁর স্ত্রী দীনময়ী দেবীর কোনও ভূমিকাই ছিল না। নিজে স্ত্রী শিক্ষার অতি আগ্রহশীল সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখান নি। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, তার কারণ এই যে "তাঁর পিতা ঠাকুরদাস স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন।" অতএব স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মস্ত বড় একটা বুদ্ধিগত প্রভেদ রয়ে গিয়েছিল। একদিকে বিদ্যাসাগর পিতামাতার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই কাটতো জনকল্যাণের কাজে। এই সব কারণে একজন আলোকপ্রাপ্ত, প্রগতিশীল স্বামীর জীবনে তাঁর স্ত্রী যে স্থান অধিকার করবেন বলে আশা করা যায় দীনময়ী কোনও দিন তা করেন নি। একমাত্র পুত্রের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের যে সম্বন্ধ তাও খুব সুখের ছিল না। তাকে তিনি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত

করেছিলেন। তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের এও ছিল একটা কারণ। বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ চন্দ্র পিতার মতই তেজস্বী ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং পিতার সঙ্গে মিটমাট করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এক ভাই দীনবন্ধু তাঁর সংস্কৃত প্রেসের উপর দাবী জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, এমন কি আদালত পর্য্যন্ত যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সবার সম্বন্ধেই উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং কখনই তাদের অর্থ সাহায্য করতে বিরত হন নি।

কিছুদিন যাবৎ বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিলেন তার ফলে তাঁর যকৃতে কঠিন আঘাত লাগে এবং পাকস্থলী এমন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, তা নিরাময়ের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বার বার স্থান পরিবর্ত্তন করছিলেন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হচ্ছিল না। একাকীত্ব এবং সম্ভবতঃ মোহভঙ্গের বিষাদে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। প্রিয় পরিজন থেকে বিছিন্ন হওয়া ছাড়াও যাদের তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এমন অনেকে তাঁকে প্রতারিত করেছিল। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রথমদিকে লোকের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, তা তাঁর জীবনের শেষভাগে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছিল। তখন সমাজে অতীতের পুনরুজ্জীবনের আর একটা অধ্যায় সুরু হয়। প্রগতিশীল মনোভাব হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছিল। তাই বিদ্যাসাগরের অবস্থা তখন বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। নূতন ভাবধারার সঙ্গে তাঁর মনের সায় ছিল না।

১৮৮৮ সালে স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পান।

ক্রমে তাঁর পীড়া কঠিন রূপ ধারণ করল। পাকস্থলীর ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। কলকাতার ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় বড় বড় ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু জীবনের শেষ পরিণতিকে এড়ানো গেল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও বৃথা হল। অবশেষে ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে কিঞ্চিদধিক সত্তর বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভাবধারার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর রামমোহনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। রামমোহন যে কাজ সুরু করে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর সে কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর প্রখ্যাত পূর্ব্বসূরীর মত তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কলহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নি, এবং হিন্দুধর্ম্মের বেষ্টনীর বাইরে গিয়ে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা করেন নি। ধর্ম্মশাস্ত্রের সীমারেখার মধ্যে থেকেই তিনি প্রগতিশীল সংস্কারের দ্বারা সমাজে বিরাট পরিবর্ত্তন আনবার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজ যেটুকু পরিবর্ত্তন গ্রহণ করতে পারে তার বেশী কিছু তিনি করতে যান নি। নিছক বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তিনি তার সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাকে হিন্দুধর্ম্মের কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার বাংলার বাইরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরের উদ্যমে কাউন্সিলে যখন বিধবা বিবাহ বিল উপস্থাপিত হয়েছিল, তখন তার সমর্থনে ও বিপক্ষে যে প্রতিক্রিয়া হয় তার উল্লেখ

সেই একই পাশ্চাত্য শিক্ষা লোকের মনে দেশের অতীত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটা গর্বের ভাব সৃষ্টি করল। পশ্চিমকে বর্জ্জন এবং অতীত ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন—এই দুই নীতি অবলম্বন করে দেশে একটা নূতন মনোভাব সৃষ্টি হল। পুনরুজ্জীবনবাদের গণ আবেদন ছিল ব্যাপক। এই মতবাদ লোকের মনে গভীর রেখাপাত করে।

রাজনীতিতে এবং সদৃশ মতবাদ ছিল চরমপন্থীদের পথ যা ছিল উদারপন্থীদের বিপরীত নীতি। চরমপন্থী রাজনীতি অনেক পরিমাণে অতীতের পুনরুত্থান এবং পশ্চিমকে পরিত্যাগ,—এই দুই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চরমপন্থী মনোভাব সমাজ সংস্কারকে গৌণ করে দিয়েছিল। চরমপন্থীদলের যুক্তি ছিল যে, রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে এবং সমাজ সংস্কারকে সাময়িকভাবে অবশ্যই পিছনে রাখতে হবে।

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় নানাবিধ তর্ক বিতর্কের মধ্যে বিদ্যাসাগরের স্থান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনি একেবারেই গোঁড়া ছিলেন না এবং অন্ধভাবে শাস্ত্রের অনুশাসন সমর্থন করতে কখনই চাইতেন না। বস্তুতপক্ষে তিনি শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে যুক্তির আলোতে যাচাই করে নিতেন। সেই হিসাবে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ও সুসম সংস্কারক। তিনি এককভাবে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ভারতবর্ষে তখন উদারপন্থী রাজনীতির প্রথম যুগ। সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ছিলেন উদারপন্থী। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সমাজ সংস্কারকে দৃঢ় করতে হলে আইন করার প্রয়োজন,—শুধু সামাজিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়। তাই সমাজ সংস্কারের

জন্য বিদেশী শাসকদের সাহায্য গ্রহণ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। নিজেদের সামাজিক ব্যাপারে বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপ পরবর্ত্তী কালে কিছু লোকের পছন্দ হয়নি। তাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর একমত ছিলেন না। তিনি বিদেশী প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্বয়ং রাণাডেও সামাজিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি। বিদ্যাসাগরের কাজের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত যুক্তিবাদ। সব সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রধান লক্ষণই এই। সে যুগে দেশের মধ্যে সংস্কারের মনোভাব জেগে উঠেছিল। দেশের শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সংস্কারের ইচ্ছা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর ছিলেন অসামান্য ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে এই ইচ্ছা মহান রূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। দেশের তথা সমাজের সকলের মনে বিবেকবোধকে এমনভাবে তিনি জাগ্রত করেছিলেন যে, সাময়িকভাবে তাঁর কাজে বাধা পেলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সাধনা সফল হয়েছিল। কারণ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম সমাজ সংস্কারের আন্দোলনও সুরু হয়েছিল। গান্ধীজী নিজে একজন প্রধান সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহের প্রবল বিরোধী ছিলেন। তার মত ছিল কুড়ি বছরের কম বয়সী বিধবাদের আবার বিবাহ হওয়া উচিৎ।

সি. এইচ হাইমসাত বলেছেন, "বিধবা বিবাহ আন্দোলন ভারতের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে অসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে।" বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে বীরসিংহ গ্রাম ছিল অখ্যাত। আজ স্বাধীন ভারতের নারীজাতির এই বীরসিংহ

গ্রামের একজন সরল, নিরাড়ম্বর, বিদ্বান ব্রাহ্মণের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করার বিশেষ কারণ আছে। ভারতের নারী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদদের মধ্যে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার

বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

চারিত্র পূজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর—মণি বাগচী

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, তিন খণ্ড—বিনয় ঘোষ

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্র মিত্র (সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা ১৯৬৭-১৯৬৮)

বিদ্যাসাগর—নমিতা চক্রবর্ত্তী

বিদ্যাসাগর—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

বিদ্যাসাগর ও পরমহংস—অমল কুমার রায়

বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প—গোপাল চন্দ্র রায়

আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, তিন খণ্ড—সুনীতিকুমার চ্যাটার্জ্জী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (রঞ্জন পাবলিসিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

ইংরাজী

বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরস্—বাকল্যাণ্ড

লিটারারি হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া—ফ্রেজার

দি হার্ট অব আর্য্যাবর্ত্ত—রোণাণ্ডসে

বিদ্যাসাগর—বিনয় ঘোষ, পাবলিকেশানস্ ডিভিসান

বিদ্যাসাগর—সুবল চন্দ্র মিত্র
এ হিষ্ট্রি অব এডুকেশান ইন্ ইণ্ডিয়া—নাসরুল্লা ও নায়েক
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্ এ্যাণ্ড হিন্দু সোশ্যাল রিফর্ম—হেইমমাথ
রিলিজিয়াস এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল এ্যাওয়েকনিং ইন্ ইণ্ডিয়া
—করুণাকরণ
ডন অব রেনেসাণ্ট ইণ্ডিয়া—কে, কে, দত্ত
হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াজ
—বি. বি. মজুমদার
ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম—চিন্তামণি সম্পাদিত
এ সেঞ্চুরী অব্ সোশ্যাল রিফর্ম—এস. নটরাজন
রিলিজিয়াস এ্যাণ্ড সোশ্যাল রিফর্ম—এম. জি. রাণাডে
(প্রসিডিংস অব দি ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল,
১৮৫৪, ১৮৫৫, ১৮৫৬)

Printed at The Central Electric Press A-12/1 Naraina Indl. Area, Phase-I, New Delhi-28.